

সতীনাথ ভাদুড়ী-র *ঢোঁড়াই* চরিত *মানস* ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*-র আখ্যান নির্মাণ ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সমান্তরাল এক ইতিহাস অনুসন্ধান: একটি নিবিড় পাঠ ও পর্যালোচনা

এম.ফিল (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক: প্রবীর মণ্ডল

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 118818 of 2012-13

পরীক্ষায় ক্রমিক সংখ্যা: MPCO194005

ক্রমিক সংখ্যা: 001700203005

শিক্ষাবর্ষ: 2017-2019

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

Declaration

I, Probir Mondal, hereby declare that the contents of this dissertation, সতীনাথ ভাদুড়ী-র *দোঁড়াই চরিত মানস* ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*-র আখ্যান নির্মাণ ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সমান্তরাল এক ইতিহাস অনুসন্ধান - একটি নিবিড় পাঠ ও পর্যালোচনা, have been written by me under the supervision of Professor Kunal Chattopadhyay. No part of this dissertation has been published anywhere or submitted for any other degree/diploma anywhere/elsewhere.

Probir Mondal

Signature of the Candidate

Date: 17/05/2019

Certified that the thesis entitled, 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামার আখ্যান নির্মাণ ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সমান্তরাল এক ইতিহাস অনুসন্ধান- একটি নিবিড় পাঠ ও পর্যালোচনা.', submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at the Department of Comparative Literature, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Probitz Mondal .
(Probir Mondal)

(Full signature of the M.Phil Student with Roll number and Registration number)

Class Roll No: 001700203005; Registration No: 118818 of 2012-2013

MPhil Examination Roll No. MPHICO 194005

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Santu Sardar entitled 'সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামার আখ্যান নির্মাণ ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সমান্তরাল এক ইতিহাস অনুসন্ধান- একটি নিবিড় পাঠ ও পর্যালোচনা.' is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University.

Pankaj Sanata Bhattacharya

Head

Department of Comparative Literature

Head
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

Kunal Chatterjee

Supervisor & Convener of RAC

Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

Barendu Mandal

Member of RAC

Associate Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

উৎসর্গ

রোহিত ভেমুলা-কে

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে দীর্ঘদিনের পাঠিত দুটি পাঠ্যকে এক্ষেত্রে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক আত্মহত্যা ক্রমবর্ধমান, ফসলের ন্যায্য মূল্য ও ঋণমকুবের দাবিতে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে; অন্যদিকে একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতাদর্শ দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র নির্মাণের যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর সেই প্রচেষ্টার অংশস্বরূপ সংখ্যালঘু হত্যা, দলিত জাতি-জনজাতির ওপর নির্যাতনের যে খাঁড়া নেমে আসছে প্রতিনিয়ত, ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথের দিকে নজর ফেরাতে গিয়ে উক্ত পাঠ দুটিকে পুনর্পাঠের প্রচেষ্টা।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ‘জাতীয়তাবাদ’ এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত শব্দবন্ধ যে কতটা প্রভাব বা গুরুত্বের দাবি রাখে, তা আলাদা করে আর আমাদের বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বেকারত্ব, কৃষি উৎপাদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্বোপরি মানোন্নয়নের মতো মূল প্রশ্নগুলি পিছনে ফেলে যখন কেবলমাত্র ধর্মের গুরুত্বটিই এক এবং একমাত্র উপজীব্য হয়ে ওঠে, তখন সেই রাজনীতিটিকে একবার তলিয়ে দেখতে হয় বই কি! ‘যে দেশে কেবলমাত্র ধর্মের মিলই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য।’ রবীন্দ্রনাথের ‘কালান্তর’ প্রবন্ধ-এর ‘হিন্দু মুসলমান’ প্রবন্ধে কথিত সেই হতভাগ্য দেশের বীজ আমরাও সুচারুভাবে কি বুনে ফেলছি না! সন্দেহ জাগে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখে এসেছি, ভাষার প্রশ্নে, ধর্মাচরণের প্রশ্নে, বাক স্বাধীনতার প্রশ্নে, সর্বোপরি অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার সংকটমূহূর্তে সেইসব লাঞ্ছিত মানুষদের ভাষ্যকে মূলধারার ইতিহাস স্বীকার তো করেইনি, করলেও তা তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের সুবিধামতো ঘটনা বিকৃতিতেও পেছপা হয়নি।

আবার এও দেখেছি, লিখিত ইতিহাসের বদলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ মানুষের নিজস্ব যে ইতিহাস, যা হয়তো লিখিত নয়, মৌখিক পরম্পরায় প্রাপ্ত, তার একটি স্বতন্ত্র বয়ানও বহমান রয়েছে। দেশের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ আন্দোলনকে কেবলমাত্র দমনমূলক নীতি দিয়ে থামানো যায় না, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ সেই কথাটিই আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দেয়। তাই বিচ্ছিন্নতার মূল কোথায় প্রোথিত, কোন কারণেই বা চেতনার বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতার এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা, সেই প্রশ্নটির উপর আমরা একবারের জন্যও কি আলোকপাত করব না?

সুতরাং, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যদি কেবল দেখি, তবে তা ভারতবর্ষের ভাবধারার পরিপন্থী। বিভিন্ন সংস্কৃতি, তাদের বিকাশের ধারা ও পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা বলে নির্দিষ্ট

কোনো দর্শন দ্বারা আধিপত্যকামী মানসিকতা নিয়ে যদি বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে তা বিচ্ছিন্নতাকেই ত্বরান্বিত করে।

বহুত্ববাদের এই দেশে বহুত্ববাদকে স্বীকার করে একতার দর্শন খুব একটা দুর্লভ নয়। একেবারেই ভিন্ন মেরুর বিভিন্ন দর্শনের সহাবস্থান দেখেছি। কখনও বা বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে তাত্ত্বিক সংঘর্ষে নব্য কোন দিকবলয় খুলে গিয়েছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া অবিরত চলেছে।

সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'-য় আমরা উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সেই চালচিত্র পাই, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে মহীরুহের আকার নিয়েছে, সেই মহীরুহ যে আমরা সহজেই উপড়ে ফেলব এমনটা নয়, কিন্তু সতীনাথ, ইলিয়াসের মতো যারা মূলধারার মহীরুহের দেহে আঘাত করেছেন, তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছেন, যে সংঘাত এখনও সমানভাবে প্রযোজ্য। সেই সমস্যা ও সংঘাতের আবর্তটিকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে আরেকবার খোঁজার প্রচেষ্টাতেই এই গবেষণা প্রয়াস।

প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের উক্ত গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়। বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রী বরেন্দ্র মন্ডল মহাশয় যিনি এ গবেষণাপত্রের সহ-তত্ত্বাবধায়ক, উক্ত গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ের উৎসের হৃদয় দিয়েছেন। এনাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বন্ধু অহিজিৎ, রীতি, অনর্ঘ্য ও দেবস্মিতা, যাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক নতুন সূত্র উঠে এসেছে, নিজের ভুলও শুধরে নিয়েছি কোন কোন ক্ষেত্রে; ওদের জন্য ভালোবাসা রইল।

প্রয়োজনীয় বইপত্র জুগিয়ে সাহায্য করেছেন বাংলা বিভাগের গ্রন্থাকারিক আইভি মোদক, ওনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রবীর মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	I
ভূমিকা	IV
প্রথম অধ্যায়:	১
দ্বিতীয় অধ্যায়:	৭
তৃতীয় অধ্যায়:	৩৬
উপসংহার	৬৩
গ্রন্থপঞ্জি	৬৮

ভূমিকা

সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ ও ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ পাঠ দুটিতে উল্লেখিত সময়কাল অনুযায়ী একটি আবর্তিত হয় ভারতবিভাগের সামান্য পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এবং অন্যটি আবর্তিত হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবিভাগের পর ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’ নামধারী রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনযুক্ত হলেও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভৌগোলিক সীমারেখা টেনে এই ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’ গঠন যে কেবলমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল কীভাবে তা চূড়ান্ত হত্যাশয় পর্যবসিত হয়, সতীনাথ ও ইলিয়াস দুজনেই তা দেখাচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে।

কিন্তু শোষিতের বয়ান যোগসূত্র তৈরি করে দেয়, দুটি পাঠের প্রবণতাকেই। সেইসঙ্গে সতীনাথের ঢোঁড়াই কিংবা ইলিয়াসের তমিজদের দেখি অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম, সেখানে তারা একই সমতলে চলে আসে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে নজর ফেরাই, তাহলে দেখব বহিরাগত আর্য়জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং স্থায়ী দ্রাবিড় জনজাতির সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দুই জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে, সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও ঘটেছে।

আর এই আদান প্রদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দক্ষিণভারতীয় ভাষা, সেখানে বৈদিক সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে গভীরভাবে, যেমনভাবে দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব ভক্তি সাহিত্যের ছাপ পড়েছে আর্য় সংস্কৃতিতে।

ধর্মীয় স্তরেও এই মিলন সম্ভবপর হয়েছিল। তাই অনার্য শিব বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। তেমনি আর্য়দেবতা বিষ্ণুও দক্ষিণভারতে অনার্য দেবতা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। সেই জন্যই উত্তর ভারতে শিব এবং দক্ষিণভারতে বিষ্ণুর সর্বাধিক উপাসনাস্থল চোখে পড়ে। লিখিত পুরাণগুলি দুই সংস্কৃতির আদান প্রদানের সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

আর এখানে যেহেতু আমরা বাংলা ভাষা সাহিত্য মাধ্যম নিয়ে কথা বলছি, সেহেতু খেয়াল করলে দেখব, বেশ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাংলা সাহিত্য ইসলামি আমলে রচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ইসলামি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছে।

মহাকাব্য পরবর্তী সময়ে যে চরিত সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, কীর্তন, ঝুমুর, পাঁচালি, ধামালি, অন্যদিকে ইসলামি চরিত সাহিত্য ‘নামা’-র যে ধারা ঔপনিবেশিক শাসনকালে সেই লোকায়ত, দেশজ সাহিত্যের চলমানতাকেই অস্বীকার করার প্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। কি সাহিত্যে কি সংস্কৃতিতে।

পাশ্চাত্যের রেনেসা-র আলোয় আলোকিত শিক্ষিত বাঙালি ‘বাঙালীর ইতিহাস নাই’ বলে পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখনীর কাঠামোটি নিয়ে বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্যেই সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির ভিত্তিপ্রস্তরটি গাঁথলেন সুচারুভাবে।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক যারা মূলতঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার এই অঞ্চলগুলিতে তাদের গৃহসাধনা ও সাহিত্য রচনা করেছিলেন, ইতিহাস অনুসন্ধানীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আদি নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করলেন ঠিকই, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তার কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন না। এই কারণে বলছি যে, চর্যাপদের অধিকাংশ পদের দিকে যদি খেয়াল করি, তাহলে দেখব সেখানে যেসব চরিত্র অঙ্কিত হচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই অন্ত্যজ, সমাজের নিম্নবর্গ বলে পরিচিত। ডোম, হাড়ি, শবর, মাঝি এরকম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা লেখনীতে আসছেন। এই ধারা পরবর্তীতেও তার বহমানতা বজায় রেখেছিল বিভিন্ন দেশজ সংরূপে। কিন্তু বাঙালির শিক্ষিত ঔপনিবেশিক চৈতন্যে এই ‘নিম্নবর্গ’ বলে চিহ্নিত মানুষগুলি ব্রাত্যই থেকে গেলেন, এমনটা শুধু নয়। সাহিত্যে ভাঁড়, বিচারবুদ্ধিহীন আপ্রাসঙ্গিক চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত হলেন। এই দোষে বাংলা সাহিত্যের তাবড় রথী-মহারথীরা অভিযুক্ত হতে পারেন।

জাতি হিসাবে বাঙালিকে গড়ে তুলতে তারা তো প্রথমত ইউরোপীয় কাঠামোয় ইসলামি সাহিত্য সংস্কৃতিকে বাতিল করলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতো সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরাও মুসলিম জনগোষ্ঠী দ্বারা লিখিত সাহিত্যকে ‘ইসলামি বাংলা সাহিত্য’ এরকম আলাদা বিভাগ তৈরি করলেন। অপরদিকে ইউরোপীয় শিক্ষাচেতনার সংস্পর্শে এসে যেখানে দলিত, অন্ত্যজ শ্রেণির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হতে পারত, সেই সম্ভাবনার পথটিকেও রুদ্ধ হতে দেখলাম আমরা।

আর এই দুটি পাঠেই দেখি অন্ত্যজ শ্রেণির মিথ, কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, প্রবাদ-প্রবচন, শোলোক, ছড়া যা দেশীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা সম্পৃক্ত, তার বিশেষ একটি জায়গা আছে দুটি পাঠেই। সেগুলো আমি দেখার চেষ্টা করেছি।

সতীনাথের তাৎমাটুলি, বিসকাঙ্কার বাসিন্দারা কথায় কথায় তাদের যাপনের বিভিন্ন ঘটনায় যেমন তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’-এর শ্লোক বিবৃত করে তেমনি ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-তে কুলসুমের ঠাকুরদা চেরাগ আলি, কেরামত আলির গলায়, মগ্নচৈতন্যে বিবৃত হয় মুনসির শ্লোক, যা সাংস্কৃতিক পরম্পরায় প্রাপ্ত।

লিখিত ইতিহাস নেই হয়তো যার, কিন্তু মৌখিক পরম্পরায় প্রাপ্ত, যা তাৎমাটুলির বাসিন্দাদের বিশ্বাসে কিংবা কালাৎকার বিলের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের যে ঐতিহ্য, তা জীবনের হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখেন তারা।

বিষয় যেহেতু উপন্যাস এই সংরূপটি নিয়ে এবং বাংলা সাহিত্যে এর ব্যবহারিক প্রয়োগকে কেন্দ্র করে সুতরাং ভাষা কাঠামোর দিকে নজর দিলে দেখব, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে ব্যবহৃত রাঢ়ীকে কেন্দ্র করে যে ভাষা আদর্শ গড়ে তোলা হয়েছিল উনিশ শতকে, যা কিনা সাহিত্যের অবশ্যস্বাভাবী ব্যবহার্য, শিষ্ট, পরিশীলিত ভাষা হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাষাকে ‘অপর ভাষা’ বা ‘ইতর ভাষা’ হিসাবেও দেগে দেওয়া হয়েছে। যেমনভাবে একেবারে সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ভাষাকে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-তে ব্যবহার করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন সেই ভাষাকে ‘হুতোমি ভাষা’ বা ‘অপর ভাষা’ বলে দেগে দিচ্ছেন।

সুতরাং, উপন্যাসে তথাকথিত মূলধারা বলে সাহিত্যের ব্যবহৃত ভাষা, চরিত্র অঙ্কনের সমান্তরালে আরও একটি প্রতিস্পর্ধী ধারা যা মূলধারার ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্ন করে, সমাজকে দেখতে চায় নিম্নকোটির মানুষের চোখ দিয়ে। যে ধারায় ত্রৈলোক্যনাথ থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অদ্বৈত মল্লবর্মন, নবারুণ ভট্টাচার্যরা লিখছেন, সেই ধারারই অন্যতম দ্রষ্টা সতীনাথ ও ইলিয়াস।

কেন্দ্রীয় উচ্চকোটির বাঙালি প্রধান উপন্যাস লেখার প্রবণতায় সেই বিকল্প ধারার প্রস্তাব রাখলেন সতীনাথ যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র উচ্চকোটির শহুরে ‘বাংগালী বাবুভাইয়া’রা নয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্ত্যজ ঢোঁড়াই। তিনি চাইলেই হয়তো ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ হিন্দিতে লিখতে পারতেন। কিন্তু ভাষা কাঠামোর মধ্যে থেকেই সাহিত্যের ক্ষমতাসীন আদর্শ রূপটির বিরুদ্ধাচারণ করলেন। ইলিয়াসও কৃষক শ্রেণির চোখ দিয়ে দেখতে চাইলেন জাতীয় চরিত্রকে।

সতীনাথের ঢোঁড়াই গড়ে উঠেছে যেমন ‘রামচরিতমানস’-এর আদলে, তেমনি ইসলামি চরিত ইতিহাস লেখনীর সঙ্গে ইসলামি ‘খোয়াব’ বা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা তাকে জুড়লেন কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে। দুটি উপন্যাসই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পৃক্ত। “...সমস্ত শিল্পকার্যেই তার সমকালীন ঐতিহাসিক যুগের ছাপ থাকে, কিন্তু মহৎ শিল্প সেইটিই যাতে এই ছাপ সবচেয়ে গভীরভাবে পড়েছে।”^২- চিত্রশিল্পী আঁরি মাতিস এর মন্তব্যটি আলোচ্য দুটি পাঠের ক্ষেত্রেই যথার্থ বলে আমার অভিমত।

উল্লেখপঞ্জি

- ১। ঈগলটন, টেরী, 'মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা', অনুবাদ: নিরঞ্জন গোস্বামী, কলকাতা: দীপায়ন, ২০০১, পৃ:
১৯-২০

প্রথম অধ্যায়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি। পুঁজিবাদ তার খোলনলচে বদলে নতুন নতুন রূপে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে সমাজের গভীরে। বলমলে বিজ্ঞাপনী প্রচারে সে শেখাচ্ছে ‘আধুনিক মানুষ’-এর মূল্যবোধের পাঠ। আর এই আধুনিক হওয়ার দৌড়ে কখনও কখনও মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে আদতে শঠ প্রবঞ্চনার অন্ধকার খাদে। আর সেই খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছে ‘আধুনিক মানুষ’ আরও আধুনিক হওয়ার প্রচেষ্টায় কি কসরতই না করছে, যাতে পুঁজিবাদের প্যাকেটজাত মূল্যবোধের মধ্যে সঁধিয়ে যেতে পারে সে সহজে। আর যারা পারল না মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটাটা সঁধিয়ে দিতে, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেই স্বপ্নকে জিইয়ে রাখল পুঁজি তার অসম্ভব কপটতায়, যাতে মৃত্যুর আগে অন্ধিও সে সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

এ জন্যই বিভিন্ন সুগন্ধী প্রসাধনী, মুখরোচক খাদ্য, পোষাক থেকে শুরু করে যে কোন ক্ষেত্রেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোন খেলোয়াড়, গায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী সহস্রে এমন অবলীলায় তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রোডাক্টগুলি যে কতটা জরুরি ছিল তা বোঝাতে এমন তৎপর হয়ে ওঠেন যে বেচারী দর্শককুল ওরফে হু ক্রেতাকুল নিজেদের দুঃখের থাকেন এই ভেবে যে তাদের জীবন ও যাপনের এমন নিস্পন্দ অগ্রগতি শূন্যতার পিছনে বুঝি এসব ‘প্রোডাক্ট’ ব্যবহার করতে না পারা।

শিকারী পুঁজি মানুষের এই দ্বিধা, সিদ্ধান্তহীনতা আর কৌতূহলের জালেই সুচারুভাবে শিকার করে নেয়। আর তারপর ধীরে সুস্থে মগজে চাহিদার ঝাঁপি খুলে বসে, সে জাল থেকে যে বেরোবে, সে সাধ্য তার কই!

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মতোই ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদ ক্রমশ তার জঠরকে স্ফীত থেকে স্ফীততর করে নিচ্ছে। তবে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের শুরুটা এরকম ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্যবসা বাণিজ্যকে ঢাল করে যখন সমগ্র ভারতবর্ষে তার অধিকার কায়েম করল, তখন প্রথমেই তারা সম্পূর্ণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করল না। ভারতবর্ষে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ধনতান্ত্রিক নীতি জুড়ে তারা আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করল। এর ফলে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটল। আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যা হল তাতে কৃষকের দুরবস্থা আরও বাড়তে লাগল। ব্রিটিশ শাসককুল যেসব কৃষক নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে কৃষকদের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। জমির মালিকানা থাকল জমিদারের কাছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে খাজনা আদায় করতে লাগল ব্রিটিশ গভর্নেন্ট। এর থেকেও বড় কথা যেসব জমিদাররা জমি কিনলেন, তাদের অধিকাংশই শহরবাসী। সুতরাং গ্রামে নিয়োজিত জমিদারের খাজনা আদায়কারীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে থাকলেন। ফলত সেইসব খাজনা আদায়কারীর পকেটে এবং জমিদারী তহবিলে সর্বোপরি ব্রিটিশ রাজকোষের বিপুল শ্রীবৃদ্ধি হলেও ফসল উৎপাদনকারী কৃষকশ্রেণি শ্রীহীনই হয়ে থাকলেন।

ব্রিটিশরা আরও যেটি করলেন, তা হল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা আমূল বদলে ফেললেন। আর এই বদল স্বরূপ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানদণ্ড হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার কাঠামোটি এক এবং একমাত্র নির্ধারক হিসাবে গণ্য হল।

এর ফলে সমাজে জমিদার শ্রেণির পাশাপাশি বিত্তের দিক থেকে অতটা ওপরের দিকে নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এমন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, যারা দেশীয় হলেও চলনে বলনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসারী। এরাই সমাজে ‘মধ্যবিত্ত শ্রেণী’ বলে পরিচিত হল। বিপুল সংখ্যায় এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারি বিভিন্ন চাকুরিতে নিযুক্ত হল। তবে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। কারণ হিসাবে বলা চলে, ব্রিটিশরা দীর্ঘদিনের চলে আসা ইসলামি শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা যে একেবারে ভেঙ্গে দিলেন সেটা তারা মেনে নিতে পারেননি।

ফলত পাশ্চাত্যের ‘রেনেসা’-র থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই দূরত্ব বজায় রাখলেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি অংশ পাশ্চাত্যের যুক্তি ও মূল্যবোধের আলোকে এমনই আলোকিত হয়ে উঠলেন যে দেশীয় শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশজ সংরূপ ও ঐতিহ্যকে তারা প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করলেন।

আর যারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না, তারা পাশ্চাত্যের ছাঁচেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাই যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হচ্ছে তখন পাশ্চাত্যের ইতিহাস লেখনীর কাঠামোতে ফেলেই মুসলিম সম্প্রদায়কে, তাদের সময়কে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে বাঙালির জাতীয়তাবাদ তৈরি করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজটি পোঁতা হল সুচারুভাবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণার রাজনীতি, যা সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে, তার প্রারম্ভটি ওই ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’ তৈরির মানসিকতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রের রাজনীতিটিও আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব সেখানেও কি বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কি চরিত্র চিত্রণে কিংবা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে মুসলিম সম্প্রদায়কে যে কেবল উপেক্ষা করা হয়েছে, তাই নয়। সরাসরি বিরোধিপক্ষ বা শত্রুপক্ষ হিসাবে দেগে দেওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, নিম্নবিত্ত দলিত কিংবা অন্ত্যজ শ্রেণির কথা সাহিত্যে তো সেভাবে এলই না, তাদের সংস্কৃতিকে বোঝার ন্যূনতম চেষ্টাও আমরা দেখতে পেলাম না। রাজনৈতিক- সামাজিক অধিকারের কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীকারের প্রশ্নে ব্রাত্যই থেকে গেলেন তারা।

ঔপনিবেশিক শোষণতন্ত্র থেকে মুক্তির জন্য গোটা ভারতবর্ষই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সতীনাথ ও ইলিয়াস দুজনেই তা দেখাচ্ছেন। একদিকে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যেমন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছে, তার পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলেও জেগে উঠেছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্দোলন।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু তা ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যতীত, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আর কি কিছু দিতে পেরেছে আমাদের? স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর পরও কি সমাজে নিম্নবর্গ বলে দেগে দেওয়া মানুষগুলোর গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষায় দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে? পালন করেনি। করলে এ লেখারই বুঝি বা প্রয়োজন হত না।

‘ কে হয় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে ’

কিন্তু সেই বেদনার ইতিহাস সাম্প্রতিক সমাজেও যেভাবে দগদগে ঘা-এর মতো অস্বাভাবিক রকম বেআরু হয়ে আছে, তাতে যতই রংচং করে পরিবেশন করা হোক না কেন, পলেন্তারা খসে সেই ক্ষুধাতুর, বাসস্থানহীন, রাজনৈতিকভাবে ব্রাত্য ভাঙাচোরা মানুষগুলোর অবয়ব ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

ঔপনিবেশিক শাসনযুক্ত ভারতবর্ষও বিভিন্ন অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের যাপন, তাদের আকাঙ্ক্ষাকেই স্পর্শ করতে পারেনি। সমাজের উচ্চকোটির চোখে তারা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভোটব্যাক্ষ তথা রাজনৈতিক ফায়দার ঘুঁটি হিসাবেই রয়ে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকার দিক থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের মতোই এ সব মানুষেরা সর্বহারাই থেকে গেলেন।

ঔপনিবেশিক সময়কালে আমরা দেখেছি, যন্ত্র প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে তার সর্বরকম আগ্রাসনের অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নির্বিচারে অরণ্য হত্যা করে, ‘মানবকল্যাণে’-র ধুরো তুলে শিল্পায়নে সামিল হয়েছে। উত্তর ঔপনিবেশিক কালেও তার ব্যত্যয় কি আমরা দেখেছি? বরং সেই প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে আরও দ্রুতগতিতে। পুঁজি তার লোলজিহ্বা দিয়ে চেটেপুটে সাফ করে দিতে চাইছে সবুজের শেষ কণাটুকুকেও। সেইসঙ্গে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ভূমিপত্র, তাদের জীবন জীবিকাকেও ঠেলে দিচ্ছে ঘোর অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে। তাই তো বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে দো-ফসলি, তিন-ফসলি জমি তুলে দিচ্ছে রাষ্ট্রের হিতাকাজীরা। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল কেড়ে নেওয়া হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষগুলোর থেকে। একদিকে তো দলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের আমরা আত্মীয়তা দিতে পারেনি, ভাষা সংস্কৃতিকে সম্মান দিতে পারিনি, উপরন্তু প্রযুক্তির ভারতবর্ষ গড়তে তাদের জীবন-যাপনের ন্যূনতম উৎসগুলোও নষ্ট করে দিতে সর্বদা সচেপ্টা। ‘ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই’ !

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানকারী এইসব নিম্নবর্গের মানুষ তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে নিজেদের মতো একটি জগৎ গড়ে তুলেছেন। শিক্ষার আলোয় আলোকিত আমাদের মানসিকতায়, রুচিতে তাদের সংস্কৃতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রুচিহীন মনে হতেই পারে। কিন্তু এ দোষ যদি তাদের দিতেই হয়, তবে শিক্ষিত সমাজ তার দায় এড়াতে পারে কি?

ঔপনিবেশিক সময়কালে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এবং প্রকৃতিকে নির্মমভাবে হত্যা করে যে ‘আমি’-র উদ্ভব ঘটেছিল, সেই ‘আমি’ কেবল আত্মস্বার্থে নিমজ্জিত আত্মকেন্দ্রিক সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। নির্বিচারে প্রকৃতি হত্যা একদিকে যেমন চলেছে, তেমনি যন্ত্রণে ‘আমি’ সত্তার এই ‘অসুখ’কে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে। ‘আমরা’-র সঙ্গে মিলতে তাকে বাধা দিয়েছে। উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ এই ‘আমি’ যা কেন্দ্রকেই পরিপুষ্ট করে, তার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছে। কেন্দ্র আর প্রান্তিকের মধ্যে যে ব্যবধান তা ঘোচাতে লোকায়ত সর্বজনীনতাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। কারণ “আমির অবলোপ ঘটে এই লোকায়ত সর্বজনীনতার ভেতর। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়-আমরা-র বহুব্যাগু স্ফূরণ ঘটে লোকায়ত সর্বজনীনতার সংশ্লেষে।”^২

শোষণতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে আমাদের সমাজে শাসকবর্গের একটি বড় হাতিয়ার হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কারণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের শ্রেণি অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়, ভীষণভাবে কনফিউজড। আসলে তারা মধ্যবিত্তের অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগগুলির মধ্যে ঠিক কোনটিতে অবস্থান করেন, নিজেরাই ঠিক করে ঠাঠা করতে পারেন না। অথচ বুর্জোয়া দেশগুলির উচ্চবিত্তের মতোই জীবন যাপন করার আকাঙ্ক্ষা সে পোষণ করে। কিন্তু বুর্জোয়া মূল্যবোধ কিংবা মানসিকতা তার অধরাই থেকে যায়। ফলে এই উচ্চ অভিলাষের স্বপ্নে বৃন্দ হয়ে সমাজের নিম্নবর্গ মানুষদের সঙ্গে তার আদান প্রদানের, যোগাযোগের সম্ভাবনাটিকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলে। কারণ মধ্যবিত্ত যে কোন প্রকারে সেই বুর্জোয়া জীবনযাপনের অংশভাগী হতে চায়। ফলে ধর্মান্ততার পথ বেছে নিতেও সে রাজি। কিন্তু পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া মানসিকতায় ধর্মান্ততার কোনো জায়গাই নেই। মধ্যবিত্তের এই বিচ্ছিন্নতা সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত যাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনযাপন হিসাবে চালাতে চায়, তা ভন্ডামি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, দলিত-নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়েছে, তখন সেই সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রাণশূন্যতা ধরা পড়ে যায়। তবে এই মধ্যবিত্ত একদিকে যেমন শোষণযন্ত্রের অংশ হিসাবে শাসকের হাত শক্ত করেছে, তেমনি এই মধ্যবিত্ত মননের ভিতরে জেগে থাকা আরেক অংশ তাকে এই শোষণযন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেও শিখিয়েছে।

মধ্যবিত্তের এক অংশ যেমন শাসকবর্গের স্বার্থ রক্ষা করতে নিবেদিত প্রাণ, অপরদিকে মধ্যবিত্তের আরেক অংশ মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিঁড়িগুলি যার প্রতি ধাপে অন্যায়, অসংবেদনশীলতা, মূল্যবোধহীনতায় জর্জরিত, তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তবে মুনাফালোভী, সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্তদের পাশে এদের সংখ্যাটি নেহাতই নগণ্য। ফলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির যারা সাহিত্য সংস্কৃতির মূল্যবোধের কপিরাইট নিয়ে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্গ বলে পরিচিত মানুষদের সংস্কৃতিচর্চার পার্থক্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে।

কোনো সামাজিক মানুষই সংস্কৃতিশূন্য জীবন কাটাতে পারেন না। ফলে ‘নিম্নবর্গ’ যে সংস্কৃতির চর্চা করে না, এ অভিযোগ হাস্যস্পন্দ। হয়তো উভয়ের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য আছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা

যাবে এইসব নিম্নবর্গের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি অনেক বেশী সজীব,প্রাণবন্ত। মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিচর্চার মতো স্পন্দনহীন চটকদার নয়। তারা যে সংস্কৃতি চর্চা করেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই জীবন ও জীবিকা থেকে সম্পর্কহীন। কিন্তু নিম্নবর্গের সংস্কৃতিচর্চা জীবন-জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

“সংস্কৃতিচর্চা তাঁর কাছে কেবল মনোরঞ্জনের ব্যাপার নয়। কৃষক যখন গান করেন তখন মন হাল্কা করার উদ্দেশ্যে করেন না। গান না করলে তাঁর শ্রম অব্যাহত রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাকে গাইতে হয়। শরীরের সঙ্গে গানও তাকে জমিতে খাটতে সাহায্য করে। মাঝির গান তার নৌকা বাইবার প্রেরণা। শুধু প্রেরণা বললে কম বলা হয়। উত্তাল নদী অতিক্রম করার জন্য তাঁর হাত দুটোর সঙ্গে গানের ভূমিকাও কম নয়। তাঁর কাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সম্মতি রেখে গানের সুর ও বাণী সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তাঁকে কীর্তন কি রবীন্দ্রসংগীত কি নজরুলগীতি কি কাওয়ালী এমনকি ভাওয়ালী গাইতে হলে নৌকা চালাবার কাজে তাঁর বিদ্বৎ ঘটবে।”^৩

মধ্যবিত্তের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও নিম্নবর্গের প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য অনেকখানি। নিম্নবর্গের মানুষ কথা বলার সময় বিভিন্ন শ্লোক, প্রবাদ, ছড়া, উপমার ব্যবহার করে থাকেন। ‘ভদ্রলোক’-এর মতো সরলবাক্য ব্যবহার তাদের ধাতে নেই। বরং উপমা, প্রবাদবাক্য যুক্ত বাক্য ব্যবহারেই তারা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। মধ্যবিত্তের নির্মিত ভদ্রলোক মানসে ‘নিম্নবর্গ’ বলে পরিচিত এইসব মানুষের প্রবাদ, শ্লোক, বলার ধরণ অনেক সময় অশ্লীল বলে দেগে দিতে পছন্দ করেন। অথচ সমাজ সংস্কৃতির হর্তা-কর্তা এসব ‘শিক্ষিত মানস’ অবলীলায় টিভি, সিনেমা-বিজ্ঞাপনের নানারকম অপ্রাসঙ্গিক ছাবলামি গোত্রাসে গিলতে থাকে আয়েস করে।

হাজার হাজার বছর ধরে এইসব অন্ত্যজ, শ্রমজীবী মানুষকে লড়তে হয়েছে প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে, তাই ন্যাকা ন্যাকা, তরল প্রকাশভঙ্গী এদের স্বভাবসঙ্গত নয়। তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে তাদের প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

“ভাষাকে তারা অলংকৃত করেন, কিন্তু স্যাঁতস্যাঁতে করেন না, নিরক্ষর শ্রমজীবীর হাতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। ভাষায় অলংকার ব্যবহার করে এরা সাহিত্যচর্চার ক্ষুধা মেটান। এতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। কিন্তু এটা তাঁদের সংস্কৃতির অংশ।”^৪

এই সংস্কৃতিচর্চাই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনবোধকে উদ্ভাসিত করে। তার জীবনযাপনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

উল্লেখপঞ্জি

- ১। দাশ, জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা: ভারবি, ২০০৭, পৃঃ ৫৬
- ২। সেনমজুমদার, জহর, 'সতীনাথ ভাদুড়ী আর আমাদের নিম্নবর্গচর্চা', সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, সম্পাঃ আফিফ ফুয়াদ, ত্রৈমাসিক চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা: দিব্যরাত্রির কাব্য, পৃঃ ২৬১
- ৩। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০, পৃঃ ১০
- ৪। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু', কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০, পৃঃ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের আলোচ্য দুটি পাঠই সমসাময়িক রাজনৈতিক আবর্তকে বুঝে নিতে চেয়েছে। তবে এই ‘বোঝা’ শাসকবর্গের রাজনৈতিক দর্শন নয়। বরং সমাজের নিম্নকোটির মানুষের কাছে যেই রাজনৈতিক দর্শন বা চেতনা কোন রূপ পরিগ্রহণ করছে, সে ব্যাপারে দুটি পাঠই পাঠকের মনোযোগ দাবি করে। স্ব-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা বাঁচানোর লড়াইয়ে নিম্নবর্গের মানুষের কীভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, কীভাবেই বা আঞ্চলিক শাসকবর্গের প্রতি এইসব নিম্নবর্গের মানুষদের অঞ্চলভিত্তিক যে লড়াই, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা ইতিহাসের সমান্তরাল অন্য এক আখ্যানের জন্ম দেয়, তা এই অধ্যায়ে আমরা আঞ্চলিক আন্দোলনের মধ্যে নৈকট্য, একইসঙ্গে দ্বন্দ্বিক সংঘর্ষের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় নিম্নবর্গের মানুষের চৈতন্যে, তার ধরণটি হয়তো বহুধাবিভক্ত, কিন্তু স্পষ্ট দিকনির্দেশক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বাঙালীর ইতিহাস নাই’ খেদ থেকে ইতিহাস হওয়ার মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষদের লড়াই, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস স্বীকৃতি তো পায়নি, উলটে তাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢেলে দেওয়া হয়েছে সুনিপুণভাবে, কারণ ইতিহাস নির্মাতারা উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখনীর গোদুঞ্জে নিম্নবর্গের মানুষদের সংগ্রামকে গোচোনা বলে বিবেচনা করেছিলেন।

শ্রেণিস্বার্থ সচেতন অধিকাংশ ইতিহাস রচয়িতাই দেখেছিলেন এইসব নিম্নবর্গের মানুষদের আক্রমণের তীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও বিদ্ধ করছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীকারের প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শাসকের মতোই ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’-এর শাসকরাও সমান উদাসীন। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের লড়াইয়ের সেই ইতিহাসকে হয় তারা সচেতনভাবে উপেক্ষা করেছেন, নয়তো উপায়ান্তর না দেখে তাকে খানিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

“নিম্নবর্গের রাজনীতির ধরনধারণ যদি স্বতন্ত্র হয়, সেই স্বতন্ত্রের সূত্র কোথায়? তা নির্ধারিত হচ্ছে কোন নিয়মে? উত্তর হল, নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সে চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে কোথায়? ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা। সাধারণ অবস্থায় নিম্নবর্গকে সেখানে কেবল প্রভুর আদর্শ পালন করতেই দেখা যায়। একমাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে। তার নিজস্ব স্বার্থ আর উদ্দেশ্য আছে,

কর্মপদ্ধতি আছে, সংগঠন আছে। উচ্চবর্গের তৈরি করা সাক্ষ্যপ্রমাণের মহাফেজখানায় যদি নিম্নবর্গের চেতনার খোঁজ করতে হয়, তবে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ দমনের ঐতিহাসিক দলিলে।”^২

সতীনাথ ভাদুড়ী এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস – দু’জনেই ভীষণভাবে রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। ইলিয়াস সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও মনে প্রাণে ছিলেন একজন বামপন্থী। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন শিরা-উপশিরায় বণ্ডিত, সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়েছেন বারবার। তাঁর কাছে বামপন্থা শৌখিন তত্ত্ব কপচানি নয়, বরং সমাজের নিম্নকোটির মানুষের যাপনের মধ্য দিয়ে, জীবন-জীবিকার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, তিনি সেই তত্ত্বকে বুঝে নিতে চান। আর তাই বামপন্থী দলগুলির পদস্বলন ইলিয়াসকে ব্যথিত করেছে। তিনি বামপন্থাকে সমালোচনার উর্ধ্ব অবস্থিত কোনো বিষয় হিসাবে দেখেননি। সমালোচনার মধ্যে দিয়েই সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখতে চেয়েছেন। ইলিয়াস মানুষের মধ্যকার সীমাহীন সম্ভাবনাকে দেখেছেন, সেই সঙ্গে কোন শোষণ বা শাসনের পিছনে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে নয় দেখতে চেয়েছেন সেই সিস্টেমটিকে যেটি ব্যক্তিকে ওই পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে।

সাহিত্যে বা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন নীতিবোধের বিষয়টির তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এজন্য একশ্রেণির মার্কসবাদীরা যারা নীতিবাকসর্বস্ব, তাদেরকে তিনি একহাত নিয়েছেন। কারণ আমরা দেখেছি বুর্জোয়া সমাজে তাঁর সুবিধামতো মতাদর্শ জনমানসে প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষভাবে চারিয়ে দিয়ে নিজেদের শোষণের কাজটিকে সচল রাখে। মার্কস নিজে ‘মতাদর্শ’-এর এই ক্ষমতালিঙ্গু দিকটি চিহ্নিত করেছিলেন এবং বুর্জোয়া সমাজের এই ভূমিকার স্বরূপটিও উন্মোচন করেছিলেন। আর সেই তাঁর দর্শনের উত্তরসূরীরাই যদি বুর্জোয়া সমাজের মতোই নীতিবোধের ধ্বজা তোলেন, তবে তা মার্কসীয় দর্শনকেই আক্রমণের নামান্তর।

বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত এই দ্বন্দ্বকে দেখতে ইলিয়াস সরলীকরণের মধ্যে হাঁটেননি। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। ক্ষোভ, হতাশা, হিংসা, ভালোবাসা এরকমই নানা মানবিক অনুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠা একটা আস্ত মানুষ। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমিক যদি কমিউনিস্ট হয়, তবে সে যে ধোয়া তুলসীপাতা হবে, ইলিয়াস এরকম আশা করেননি। কমিউনিস্টদের নিজস্ব দর্শন, কর্মসূচী, সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকবে, তা বলে সেই দর্শন কখনওই নৈতিকতার নামান্তর নয়। অনেক কমিউনিস্ট লেখকদের আমরা দেখি যারা প্রলেতারিয়েতের যৌনজীবন দেখাতে চাননা কিংবা অস্বস্তি বোধ করেন। কৃষককে মহান সংগ্রামী চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলতে তারা প্রায়শই যে ভুলটি করে ফেলেন, তা হল “... আসল শ্রমিককে প্রত্যাখ্যান করলো, অস্বীকার করলো। মনগড়া একজন শ্রমিক তৈরি করল। ... ইচ্ছাকে বাস্তবতার উপরে চাপিয়ে দিতে পারিনা। ... বাস্তবতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনা দেখানোর তাই প্রথম ও শেষ যেটা দরকার সেটা হলো বাস্তবে যথার্থ কোনো সমাজতান্ত্রিক পার্টির সক্রিয় কার্যকলাপ এবং মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্র-চেতনার চর্চা। সেটা না থাকলে আমি জোর করে কীভাবে দেখাবো।”^২

দুঃখের বিষয় হল এই যে , ইলিয়াস তাঁর সমসাময়িক অবিভক্ত পাকিস্তান ও পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে বামপন্থীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অসন্তোষ ব্যক্ত করে এ মন্তব্য করলেও দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা সমান প্রাসঙ্গিক।

ইলিয়াস প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৯৬৯ সালে যে ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই গণ আন্দোলনকে বামপন্থীরা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং বামপন্থীদের রাজনৈতিক আন্তরিকতা, সংকল্পের ভিত্তি নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা একটা বড়ো কারণ। যে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে , তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে উঠে এসেছিলেন, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে পৌঁছে তারাও সেই শ্রমজীবী , কৃষিজীবী মানুষের মাথায় বন্দুক ঠেকাতে , নির্বিচারে হত্যা করতে ন্যূনতম দ্বিধা বোধ করেননি। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা নিম্নবিত্ত মানুষকে কেবল সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। আর এতেই তারা নিজেদেরকে ‘মহান বিপ্লবী’ বলে ভেবে ‘ঐতিহাসিক ভুল’ করে বসেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষকে কেবল পার্লামেন্টের রাজনীতির অলিন্দে পা রাখার সিঁড়ি না ভেবে যদি মর্যাদাবোধের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারতেন , তবে আজকের বামপন্থীদের এভাবে হয়তো জনবিচ্ছিন্ন হতে হতো না। ইলিয়াসের ভাষে, “ মানুষ শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়। কিংবা কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কেবল প্রয়োজনীয় উপকরণমাত্র নয়। শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের নির্মাতা। তাদের জীবন যাপনকে তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং শ্রমজীবীর জীবনযাপন ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে জীবনের গভীর সত্যকে অনুসন্ধানের ভেতর শিল্পচর্চার অর্থময়তা নির্ভর করে। তত্ত্বের ভেতর যে সত্য আছে, তাও উন্মোচিত হবে এই অনুসন্ধানের ফলেই।”^৩

অন্যদিকে সতীনাথ ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি , তবে দেখব তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনেও অংশ নিয়েছিলেন। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী সতীনাথ রাজনীতির সূত্রে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সামাজিকভাবে এই মেলামেশাই তাঁর মধ্যে এক রাজনৈতিক বোধের জন্ম দিয়েছিল, যা তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়তো মন্ত্রীত্বও পেতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। তিনি দেখছিলেন প্রান্তিক মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে মার্কসবাদ ক্রমশঃ এইসব সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের মানবিক আশ্রয় ও অবলম্বন হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বুঝেছিলেন কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। তাই কংগ্রেস ত্যাগ করার পর কিছুদিন সোস্যালিস্ট পার্টিতে ছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে ত্যাগ করেন। আসলে তিনি তার সঠিক মনোভূমির সন্ধানটি পাচ্ছিলেন না। সমাজবদলের আশায় গান্ধীবাদকে গ্রহণ করেছিলেন সতীনাথ। কিন্তু সেই গান্ধীবাদী দর্শনের ধারক ও বাহকদের নির্লজ্জ, স্বার্থপর, ক্ষমতাকাতর রূপ দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সব রাজনৈতিক দলই কেন্দ্রীয় সুবিধাবাদে আচ্ছন্ন। তাই কোনো ‘গণনায়ক’ তৈরি করার তাগিদ তাদের নেই। তারা কেবল চায় অন্ধ আনুগত্য। আর এই অন্ধ আনুগত্যকে হাতিয়ার করেই তারা ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে চান। বাকসর্বস্ব রাজনীতি কেবলই আশা-আকাঙ্ক্ষার ফানুস ওড়াচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল স্তরের মানুষের মানোন্নয়নের প্রশ্ন সেই অন্ধকার গলিতেই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে থাকছে।

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও আমরা যেমন দেখছি, সতীনাথও তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিতে তা দেখেছিলেন-“কংগ্রেসের কাজ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল। সে কাজ তো হাসিল হয়েছে। এখন ‘রাজকাজ’ ছাড়া কোনো কাজ নেই আর।”^৪

অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তগত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেভাবে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন, কিন্তু ক্ষমতায় এলেই কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ‘যে কে সেই’ অবস্থা। অবস্থার উন্নতি কেবল হয় বড়ো বড়ো কর্পোরেট সংস্থা, দেশীয় ও বিদেশি পুঁজিপতিদের। দেশের জিডিপি বাড়ে। কোটিপতিরা আরও কোটিপতি হন। তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে আইন তৈরি হয়। কারণ তারাই তো ঠিক করেন তাদের স্বার্থ কাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী সুরক্ষিত থাকবে। পুঁজির এই যুগে তারাই নিয়মনীতির নির্ধারক। আর অন্যদিকে প্রান্তবাসী মানুষ ন্যূনতম সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন ক্রমাগত, প্রতিনিয়ত।

একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীবাদী আন্দোলন এক ব্যাপক ও বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। অহিংস নীতিতে সত্যের প্রতি গান্ধীর যে আহ্বান তার অভিঘাত ভারতবর্ষের হৃদয়ে গভীরভাবে পড়েছিল। মানবিক জীবনদর্শনই ছিল গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনের গভীরতম অভিপ্রায়। নিম্নবর্গের মানুষদের ‘হরিজন’ বলে বুক টেনে নিলেও তাদের প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি। তাঁর উত্তরসূরীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলেও নিম্নবর্গের মানুষদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন থেকেছেন। সেজন্যই তো স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দলিত মহিলাদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ, ধর্ষণ, শুধুমাত্র দলিত এই পরিচয়ের জন্য সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির হাতে এখনও দলিত নিগ্রহ সংঘটিত হচ্ছে। স্রেফ না খেতে পেয়ে দলিত জাতি-উপজাতির মানুষদের মৃত্যুর খবরও প্রযুক্তিতে ক্রমসমৃদ্ধ ভারতবর্ষের মাটিতে সার্বিক উন্নয়নের ভাঁওতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আর এই জায়গা থেকেই সতীনাথ ও ইলিয়াসের পাঠ দুটি নেমে পড়ে ভারত অনুসন্ধান। এ অনুসন্ধান শাসকের উপর থেকে নীচে দেখা নয়, সমাজের নিম্নকোটির চোখ দিয়ে যে ব্যবস্থায় তারা প্রতিনিয়িত নিষ্পেষিত, সেই ব্যবস্থাকে দেখা।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রামরাজ্য- এই ধারণাটি কী প্রবলভাবে উপস্থিত, তা আর আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের ন্যূনতম চাহিদা, জীবিকা, মানোন্নয়নের চেয়েও এই ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির কারবারিরা যখন ‘পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের’ অংশীদার হতে চান, তখন সেই মনোভঙ্গিটির প্রতি আমাদের গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বই কি!

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ‘টোঁড়াই চরিতমানস’ লিখতে গিয়ে আবহমান কাল থেকে চলে আসা ভারতবাসীর প্রিয় রামকথারই অন্য এক আখ্যান, যার আদলে একালের টোঁড়াইয়ের কথা শোনানো যেতে পারে, সতীনাথের ভাষে, “টোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের থেকে ছোটো আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা...”^৫

তুলসীদাস নিজে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও ‘রামচরিতমানস’ রচনার ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করেননি। এমনটা শুধু নয়, মান্য হিন্দি ভাষাও তিনি ব্যবহার করলেন না। পরিবর্তে বিস্তীর্ণ উত্তর ভারতে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ‘আভিধি’ ভাষাতে রচনা করলেন তাঁর রামকথা। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রামভক্তিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্য রামকথাকে গান, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। ‘রামচরিতমানস’ –এর মূল আখ্যান উৎস ‘বাল্মীকি রামায়ণ’ হলেও অন্যান্য আঞ্চলিক রামকথাকেও তিনি তাঁর কাব্যের গঠন শরীরের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাকাব্যকে ‘দূষিত’ করার অভিযোগ সে সময়ও তার বিরুদ্ধে উঠেছিল। এ আসলে যুগে যুগে, দেশে-দেশে কবি সাহিত্যিকদের উপর নেমে আসা ভীষণ চেনা অভিযোগ। সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্মের কপিরাইট নিয়ে রাখা ক্ষমতাসালীর দল ভিন্ন সুর উঠে আসলেই, তাকে গলা টিপে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ওঠেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারেন না, বা বুঝতে চান না যে, দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলালেই প্রেক্ষিত, চরিত্র, কথনভঙ্গি, ভাষা ব্যবহার ও তার প্রকাশভঙ্গিরও বদল ঘটে যায়। বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস, মধুসূদনের মতো অনেকেই মূল বাল্মীকি রামায়ণের সেই কাহিনীসূত্রকেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কীভাবে দেখছেন, তার ওপরেই একই কাহিনীসূত্রের বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হচ্ছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভক্তিরসে আর্দ্র কিন্তু মধুসূদন আধুনিক যুক্তবাদী চৈতন্য দিয়ে দেখেছেন রামায়ণের কাহিনীবৃত্তকে। এজন্য কৃত্তিবাসের রামকে মহৎ,

মানবেত্তর চরিত্র হিসাবে দেখলেও মধুসূদন রাগ-দ্বেষ, ঘৃণা-ভালোবাসা সহ মানবিক গুণসম্পন্ন রাবণকে মহৎ চরিত্র হিসাবে দেখলেন। এজন্য ভাষার প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য ঘটে যাচ্ছে। পয়ারের বদলে ভাষা কাঠামোয় তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করছেন মধুসূদন। তাই বিষয়ের থেকে সেই বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এটা ভীষণভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই উপস্থাপন ভঙ্গিটিই বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাদের পার্থক্যকে সূচিত করে তোলে।

সতীনাথও ‘এ যুগের রামচন্দ্রের’ গল্প শোনাতে, সাহিত্যে বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সেই কবি তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’-এর কাঠামোটিকে তাঁর ‘টোঁড়াইচরিত মানস’ এর বহিঃশরীর হিসাবে গ্রহণ করলেন। আর বর্তমানের ভাঙাচোরা, বিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে রামচন্দ্র কীভাবে বদলাচ্ছেন, নিম্নবর্গের টোঁড়াইদের দিয়ে সেই অন্তঃশরীর নির্মাণ করলেন।

তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যাকাণ্ড, কিঙ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড এই সাতকান্ডে বিন্যস্ত। আর সতীনাথ ‘এ যুগের রামচন্দ্র’ টোঁড়াইয়ের যাপনের আখ্যান বিন্যস্ত করেন- আদিকাণ্ড, বালকাণ্ড, পঞ্চগোয়েত কাণ্ড, রামিয়া কাণ্ড, সাগিয়া কাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, হতাশা কাণ্ড-এ। গঠনগত এ সাদৃশ্যের অভিপ্রায় সতীনাথ নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন, “...ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমস্ত গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে; পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।.....এযুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। একারণেই টোঁড়াইরামের আবির্ভাব আমার মনে। এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অচল মনে হয়েছিল। কেননা আমার কাজ ছিল পুরনো মহাকাব্যের স্ফেমে টোঁড়াইরামকে বাঁধানো।”^৬

পাঠক হিসাবে ‘টোঁড়াইচরিত মানস’ পড়তে গিয়ে বারবার থমকে যেতে হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অর্থের দুর্বোধ্যতায়। ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, সতীনাথের এ এক সচেতন প্রয়াস। বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে ভানুমতীর প্রশ্ন ছিল, “ভারতবর্ষ কোন্ দিকে?”- কারণ, ভানুমতীদের ভারতবর্ষ, আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে প্রভেদ যে বিস্তর! তবু ‘আরণ্যক’ পড়তে গিয়ে কিন্তু আমাদের অস্বস্তিবোধ হয় না। কারণ যে বিষয়টি বলা হচ্ছে, তা আমাদের কাছে অপরিচিত হলেও যেভাবে বলা হচ্ছে, তা আমাদের অপরিচিত নয়। কারণ তা আমাদের চেনা রোমান্টিক মধ্যবিত্তের কথনভঙ্গিতেই বলা। উপন্যাসের কথক সত্যচরণ তাই যেভাবে দেখেন প্রকৃতি সংলগ্ন পেশাহীন গরীব মানুষগুলোকে, “মানুষের লোভ বড় বেশি, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনা ঘাসের এক কাঠা দানার জন্য প্রকৃতির এমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করতে তাদের বাধে না।”^৭ -এ মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ ছাড়া আর কি! কিন্তু ওই প্রকৃতির উপর জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল মানুষগুলোর চোখ দিয়ে গল্পের কথক যদি দেখতেন,

তাহলে ভারতবর্ষের নাম না শোনা মানুষগুলো বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রচেষ্টায় কীভাবে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তা অনুধাবন করতে পারতেন।

মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ সে সুযোগ দেয় না। তাই ‘আরণ্যক’ মধ্যবিত্তকে সজাগ করলেও সচেতন করে না। অন্যদিকে সতীনাথ এ সুযোগ দেন না পাঠককে। তাকে ক্রমাগত অস্বস্তিতে ফেলেন। মধ্যবিত্তের ভাবালু, রোমান্টিক দৃষ্টিকোণকে আক্রান্ত হতে দেখি বারবার। মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণপ্রধান বাংলা কথাসাহিত্যে এমনভাবে নিম্নবিত্ত, অন্ত্যজ মানুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার বাঙালীর অভ্যস্ত সাহিত্যসাধনাকে বেশ অনেকখানি প্রশংসিতের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এপিক কথনরীতিকে আশ্রয় করে রামচন্দ্রের আদর্শে অন্ত্যজ ঢোঁড়াইকে গড়ে তুলতে চাইলেন সতীনাথ। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ পেরিয়ে যন্ত্রসভ্যতার যুগে পৌঁছে ঢোঁড়াইদের বিবর্তনকে দেখতে চাইলেন নিবিষ্টচিত্তে। বস্তুত, এপিক কথনরীতিকে আশ্রয় করেই সেই এপিক কথনরীতির ভাঙনকেই তুলে ধরলেন সতীনাথ তাঁর ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এ।

‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এর রচনাকালের দিকে যদি একটু দৃষ্টি ফেরাই, তবে দেখব, এই পাঠের প্রথম চরণের প্রকাশকাল ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয় চরণের প্রকাশকাল ১৯৫১, আর এই পাঠে যে সময়খন্ডকে ধরা হয় তা মোটামুটি ১৯১২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত অর্থাৎ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছে এ পাঠের আখ্যান, গড়ে উঠেছে ঢোঁড়াই। ঢোঁড়াই কেবলমাত্র একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্ট হয় না উক্ত পাঠে। বরং বহুমাত্রায় সে ছড়িয়ে থাকে গোটা পাঠ জুড়ে। কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এ লড়াই চলতে থাকে ব্যক্তি (ঢোঁড়াই) বনাম সমাজ (তাৎমা), ব্যক্তি (ঢোঁড়াই) বনাম ব্যক্তি (সামুয়র), গোষ্ঠী (তাৎমা) গোষ্ঠী (ধাঙড়) -এর মধ্যে। আর এরকম আরও নানা সংঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে কাহিনীর আখ্যানভাগ।

ঢোঁড়াই থেকে ঢোঁড়াই ভকত, ঢোঁড়াইজি হয়ে শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের রামায়ণজী হওয়ার যে বিবর্তন, সেই যাত্রাপথটি আমরা দেখে নেব এবার। ‘আদিকাণ্ড’-এর শুরুতেই সতীনাথ তাঁর পাঠের ঘটনাস্থল বিষয়ে পাঠক কিংবা শ্রোতাকে সতর্ক করে দেন-“ অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে নাম লেখা আছে ‘জীর্ণারণ্য’। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও।”^৮

এখানেই সতীনাথ এপিক কথনরীতির সঙ্গে জুড়ে ফেলেন তাঁর পাঠকে। কারণ, রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকিরও মনে হয়েছিল লব ও কুশ-ই রামকথা শোনানোর উপযুক্ত। এক্ষেত্রে কথক মিসিরজীকে দিয়ে তাঁর এই ঢোঁড়াইকথা পড়িয়ে নেওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু পাঠক ঢোঁড়াইরামের গল্প বিবরণ মিসিরজী হিসাবে সতীনাথের কাছ থেকেই শুনে নিতে চায়।

রামের ‘জীর্ণাৱণ্য’-এর পরিবর্তিত রূপ জিরানিয়া জায়গাটির বর্ণনা করলেন এইভাবে- “ৱেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে “জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া...।”^৯

কথকের বিবরণে জিরানিয়া বিষয়ে এই তচ্ছল্য তার প্রবহমানতা বজায় রাখে তাৎমাটুলির লোকেদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়েও। বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান তাঁদের স্বল্প হলেও অজ্ঞানতার গর্ব তাঁদের কম নয়। কথকের বিবরণে, “তাৎমাটুলির লোকেৱা একেই বলে ‘টৌন’ (টাউন)। যেমন তেমন হেজি-পেঁজি শহর নয়- ‘ভারী সাহার’ , পীরগঞ্জ থেকেও বড়। পীরগঞ্জে কলস্টর (কালেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাত্রী সাহেবের গির্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘন্টায় ঘন্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে; পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।” (পৃ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যই, “ এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন?” (পৃ)-এরকম বাচনভঙ্গি সাধারণত বিচলিত করে না আমাদের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকদের। সেজন্যই নির্ভেজাল আমোদে এমন মজার বিবরণ পড়তে থাকি। কারণ আমরা তো প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয় মানুষগুলোর থেকে যোজন দূরত্বে আছি। খেয়াল করি না কেবল বিবরণের মধ্যকার কথকের শ্লেষটিকে। ‘ঘন্টায় ঘন্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়’- কোথা দিয়ে?- ‘পাকা রাস্তা দিয়ে!’ ‘দোতলা বাড়িও আছে’-কার সেটা?- ‘চেরমেন সাহেবের’!

রোজগারে, বিশ্বাসে-সন্দেহে, ভালোবাসায় সর্বোপরি, তাৎমাটুলির বাসিন্দাদের জীবনধারার সঙ্গে তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’কে সম্পৃক্ত থাকতে দেখেছেন সতীনাথ। ফলত অতপরিচিত এপিকের আঙ্গিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চেতনা কিংবা রুচিতে অপরিচিত বিষয় ও মানুষদেরকে তুলে এনেছেন ‘টোঁড়াইচরিত মানস’-এ। ‘রামচরিতমানস’-এর মতো সাতটি কাণ্ড আছে বটে সতীনাথের পাঠে। কিন্তু খেয়াল করার বিষয় কাণ্ডগুলির অন্তর্গত শিরোনামগুলি। শিরোনামগুলি স্পষ্টতই মক্-এপিক প্যাটার্নে লেখা। সেখানে মধ্যবিত্তের ব্যঙ্গপ্রবণ দৃষ্টির সাক্ষাৎ আমরা পাই, তবে তার তীরটি তাক করা থাকে, সেই মধ্যবিত্তেরই নিম্নবিত্তের সঙ্গে সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন মানসিকতার দিকেই।

টোঁড়াইয়ের জন্মবৃত্তান্ত কথক শুরু করেছেন টোঁড়াইয়ের মা বুধনীর মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে-

“...টোঁড়াই যেদিন পাঁচদিনের সেদিন ‘টৌনে’ ছিল একটা ‘ভারী তামাসা’। আর একদিন আগেই যদি টোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী দুদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আদাবাটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেইটা তেলে ভেজে! মরণ!”^{১০}

সেই ‘বিলি বাচ্চা’ টোঁড়াইয়ের দেড় বছর বয়সে তার বাবা চাঁদমারীর মাঠে হাওয়াগাড়ি দেখতে গিয়ে ফিরে এসে কয়েকদিনের প্রবল জ্বরে মারা যায়। তাৎমা জাতের চিরাচরিত বিশ্বাস আর একবার প্রামাণ্যতা পায়,”জ্বর কী

জন্যে হয় তা আর তাৎমাদের বলে দিতে হবে না-সবাই জানে, আশ্বিনের পরে জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।”^{১১}

তাৎমা সমাজের নিয়ম অনুযায়ী, অন্যদিকে ঢোঁড়াইয়ের বুধনীও ‘সিনুর লাগানোর’ ইচ্ছায় ডিস্টিবোডের ‘ভাইচেরমেন সাহেবের চাপরাসী’ বাবুলালের সাথে ‘চুমৌনা’ হয় এই শর্তে যে ঢোঁড়াইকে সে (বুধনী) সঙ্গে রাখতে পারবে না। অনিবার্যভাবে প্রায় একরকম অনাথই হয়ে পড়ে ঢোঁড়াই। এখান থেকেই শুরু হয় ঢোঁড়াইয়ের ‘থেকেও না থাকা’র জগতে প্রথম পদক্ষেপ।

তাৎমাটুলির বুড়িদের বিশ্বাসানুযায়ী, টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া ‘বৌকা বাওয়া’ই হয়ে ওঠে ঢোঁড়াইয়ের শেষ আশ্রয়স্থল। বৌকা বাওয়ার স্নেহ-প্রশ্নে-শাসনে বেড়ে উঠতে থাকে ঢোঁড়াই। মায়ের সংস্পর্শে থাকার আসক্তি, আর সেই আসক্তির ক্রমাগত অপমৃত্যু, স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র অভিমানে পর্যবসিত করে। নারীজাতির ওপর ঢোঁড়াইয়ের বিতৃষ্ণার একরকম বাহ্যিক রূপ দেখাতে থাকেন কথক। কিন্তু আমরা সেই বাইরের খোলসটি সরিয়ে যদি দেখি, তাহলে দেখব ভিতরে ভিতরে ঢোঁড়াই কী প্রচণ্ড স্নেহবুভুক্ষু, ভালোবাসার কাঙাল।

নানারকম সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সেই রাজনীতির স্বরূপটি কীভাবে উন্মোচিত হয় ঢোঁড়াইয়ের চেতনায়, সেটিকে আমরা বুঝে নিতে চাইব। তাৎমাটুলির পঞ্চ-সমাজের সঙ্গে নানা দ্বন্দ্ব-সংস্কৃত্যয় গড়ে ওঠে কাহিনীর প্রথম চরণ। তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির বাসিন্দা নিম্নবর্ণের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতার রূপটিও কথক স্পষ্ট করে দেন ‘ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত’-এ।

“ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে ‘বুড়বক কিরিস্তান’ (বৌকা খৃষ্টান)। ... ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায়না।” (ধাঙড়টুলির বর্ণনা)

উভয় সম্প্রদায়েরই যাপনের একটা দিক এই লড়াই। কিন্তু গান্ধিজীর নেতৃত্বে ‘সুরাজ’ (স্বরাজ) আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাদের বেঁচে থাকার বাস্তবতাকে প্রকট করে তোলে। স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানীর দল নিজেদের আখের গোছাতে কীভাবে গান্ধিজীর ‘স্বরাজ’কে ব্যবহার করে, সতীনাথ তাঁর ‘গান্ধী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণণা’ পরিচ্ছেদে তা দেখিয়েছেন।

‘গান্ধী আদর্শ’কে নয়, ব্যক্তি গান্ধীর উপর ঐশ্বরিক, আলৌকিক আরোপ চাপিয়ে এইসব নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে তাদের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে চেয়েছে। আর কথকও কি গ্লেশের সঙ্গে সে বর্ণণা পেশ করেন পাঠকের কাছে।-

“...বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কী করা যায়? এরকম করে তো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদুরে ফেলে রাখা যাওয়া না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার...” (গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণণ)

বস্তুতপক্ষে, উক্ত বিবরণ আমাদের কাছে হাস্যকর হলেও এ সতীনাথের কোন কষ্ট কল্পনা বা সেই কল্পনায় বানানো কোনো বাস্তবতা নয়। এভাবেই গান্ধী পৌঁছেছিল বা বলা ভালো পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের কাছে। গান্ধী কীভাবে মহাত্মাতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, এ বিষয়ে শাহিদ আমিন বিশ্লেষণধর্মী, ভীষণভাবেই তথ্যসমৃদ্ধ একটি গবেষণা সন্দর্ভ আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

গান্ধীজি ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি একদিনের জন্য উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় আসেন। কিন্তু পরবর্তীতে জনমানসে তাকে যেভাবে বিভিন্ন কৌশলে প্রকল্পায়িত করা হয়, তার ধারাভাষ্যটি শাহিদ আমিনের গবেষণা থেকে দেখে নিতে চাইব, যা সতীনাথের ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ এ নিম্নবর্গের মানুষদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটি বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গোরখপুরের সভায় গান্ধী স্বরাজ লাভের যে পথনির্দেশিকা দিয়েছিলেন শাহিদ আমিনের তথ্যানুযায়ী, তা মোটামুটি এইরকম-

“...১) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, ২) যেসব কাজ করা জনগণের পক্ষে অনুচিত-লাঠির ব্যবহার, হাটবাজার লুঠ, সামাজিক বয়কট, ৩) মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুগামীদের যা যা বর্জন করতে বলেন-জুয়া, মদ-গাঁজা, বেশ্যালয় যাওয়া। ৪) উকিলদের কর্তব্য ওকালতি ছেড়ে দেওয়া, সরকারি বিদ্যালয় বয়কট করা, এবং সরকারি খেতাব বর্জন করা উচিত, ৫) সাধারণের উচিত তাঁত বোনা, তাঁতিদের উচিত হাতে বোনা সুতোয় কাপড় তৈরি করা, ৬) স্বরাজ আসন্ন, কিন্তু স্বরাজের জন্য প্রয়োজন আত্মিক শক্তি ও শান্তি, ঈশ্বরের কৃপা, আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি।”^{২২}

উনিশ শতকের শেষ দশকে গোরখপুরে গো-রক্ষণী সভা, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু সমাজসংস্কার আন্দোলন আদতে ছিল “ জাতীয়তাবাদী কর্মধারায় অপ্রত্যক্ষ সাহায্যের মতো।”^{২৩}

জাতি ও বর্ণকে ভিত্তি করে যেসব সভাগুলি গড়ে উঠেছিল, খেয়াল করলে দেখা যাবে, সেখানে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পঞ্চগায়েতে খাদ্যাভ্যাসে বহু বাহু বিচার শুরু হয়। ১৯২০ এর ডিসেম্বরে ভিত্তিগ্রামে প্রচুর মেথর, ধোপা, নাপিত সর্বোপরি বহু নিম্নবর্গের মানুষ আমিষ, নেশাদ্রব্য সেবন ত্যাগ করে।

আসলে ইংরেজ বিরোধিতা ইংরেজদের প্রতি নীতিগত বিরুদ্ধতা অপেক্ষাও ধর্মাচরণের পর্যায়ে নেমে আসে। আর জাতীয়তাবাদী ‘ধর্মপ্রচারকদের’ প্রচারিত ধর্ম, পালনীয় ধর্ম বলেই অনেক নিম্নবর্গের মানুষ নির্বিচারে মেনে নেন।

গান্ধীকে স্বয়ং ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূতের পর্যায়ে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে তাদের আন্দোলনের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

এরকমই বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন গবেষক শাহিদ আমিন সমসাময়িক ‘স্বদেশ’ সহ অন্যান্য পত্রিকায় পাঠানো গান্ধীবিশ্বাসী কিছু মানুষের বক্তব্য। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাইব।

“ ২। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ, বসন্তপুরের এক কাহার মহাত্মাজিকে সাচ্চা মানবে বলেছিল, একমাত্র যদি তার বাড়ির চাল উপরে উঠে যায়। লোকটার বাড়ির চাল দেওয়াল ছেড়ে একহাত উপরে উঠে গেল। আবার স্বস্থানে ফিরে এল। তখনই কাহার, যখন মহাত্মাকে মেনে নিয়ে কেঁদে উঠল।...

৯। গোরখপুর বিদ্যালয়ের শ্রী বলরাম দাস ‘স্বদেশ’ পত্রিকায় লিখে জানান যে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে তিনি রুদ্রপুর গ্রামে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। মহাত্মা নির্দিষ্ট পথ সেখানে সবাই স্বীকার করে নেয়। এক ব্যক্তি শুধু তার পুরনো অভ্যাস ছাড়তে নারাজ, সে ঘাস কাটতে চায়, ফিরে এসে সে পাগল হয়ে গেল, জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে লাগল। মহাত্মার নামে পাঁচটাকা দেওয়ার পর সে শান্ত হয়। ...

১২। বেনুয়াকুটি মৌজায় মৌনীবাবা রামানুগ্রহদাস বার বার গান্ধীকে গালমন্দ করছিলেন। ফলে তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরতে থাকে। খানিক যত্ন নিলে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। মৌনীবাবা তখন যজ্ঞহুতির আয়োজন করলেন। ...

২১। রাও চক্রীপ্রসাদ লিখেছেন, ভাত্নি স্টেশনের কাছে এক পানবিক্রেতার ছেলেরা ছাগল মেরে তার মাংস খেয়েছিল। যারা বাধা দিয়েছিল তাদের কারও বারণই ছেলেরা মানেনি। একটু পরেই তারা বমি করতে থাকে, ভয় পেয়ে যায় সবাই। শেষ পর্যন্ত তারা মহাত্মার নামে শপথ নেয়, আর কোনওদিন মাংস খাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়।

২৪। গোদবাল গ্রামে ২২ ফেব্রুয়ারি এক সাধু এসে গাঁজার ছিলিমে টান দিচ্ছিল। মানুষজন তাকে থামাতে চাইল, শুরু হল মহাত্মার প্রতি তার কটুকাটব্য। পরদিন সকালে দেখা গেল, তার শরীর বিষ্ঠায় ভরা। ...

৩৯। মির্জাপুর বাজার, যেখানে জল আপনা আপনি বেরিয়ে এসেছে, ভক্তরা সেখানে দান করেছে ২৩ টাকা ৮ আনা ১২ পাই। শ্রীছেদিলাল এই টাকা গোরখপুর স্বরাজ অর্থভাণ্ডারে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন।”^{২০}

- উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি, জাতিয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজি নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে কিভাবে নির্মিত হয়েছিলেন। গান্ধীর এই অলৌকিক, মহামানবিক চরিত্র নির্মাণে ‘স্বদেশ’এর মতো সাময়িকপত্র কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এধরণের মহাত্ম্যপূর্ণ অলৌকিক গুণব, কিংবা অবাস্তব

ঘটনাকে কখনও প্রত্যক্ষত কখনও পরোক্ষত সমর্থন জুগিয়েছেন। কারণ, নিম্নবর্ণের আত্মিক মুক্তির থেকে রাজনৈতিক ফায়দার বিষয়টি তাদের কাছে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এটা ঠিক এখনকার টেলিভিশনে পরিবেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা বিজ্ঞাপনের মতো। ঢাকঢোল পিটিয়ে, বিভিন্ন ভাঁওতাবাজির প্রদর্শন হবে। কিন্তু পরিবেশক গোষ্ঠী তার কোনো দায় নেবেন না। ‘বিধিসম্মত সতর্কীকরণ’ দিয়ে সেই পরিবেশিত বিষয় থেকে সুবিধাজনক দূরত্ব বজায় রাখবেন, অন্যদিকে অর্থনৈতিক মুনাফাও করে যাবেন সমানতালে। এক্ষেত্রে বিষয়টি খানিকটা সেরকমই। তাই এইসব সুবিধাবাদীদের হাতে গান্ধী আদর্শ ‘ধর্মীয় বিশ্বাস’-এ পর্যবসিত হয়। এমনই সে বিশ্বাস, যা হতে হবে যুক্তি-তর্কহীন। তাকে কোনো পরিস্থিতিতেই প্রশ্ন করা যাবে না। বিনা প্রশ্নে, বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে মেনে নিতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার না করে, তবে শাস্ত্রীয় বিধানের মতোই প্রায়শ্চিত্ত বা পাপখন্ডনের নানা পন্থার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হবে। আদর্শ যেখানে ভীতি, প্রায়শ্চিত্তের পরাকাষ্ঠা, যেখানে আদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হওয়া কী আদৌ সম্ভব?

সতীনাথের পাঠেও কুমড়োতে আসা ‘গান্ধী বাওয়া’কে ‘লোহা মানে’ (বিশ্বাস করে) তাৎমাদের রেবতীগুণী (গুণিণ)। কিন্তু রেবতীগুণীর আপাত সরল বয়ানের মধ্যেও তীব্র শ্লেষ ছড়িয়ে রাখেন সতীনাথ-

“ কেবল হাত-পা ওঠেনি- জগন্নাথজীর মতো”^{১৪}

-এ যেন অনেকটা গান্ধী আদর্শের বাহ্যিক অবয়বের মতো, কিন্তু তার প্রায়োগিক দিকটি অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ার মতোই।

গান্ধী বাওয়ার ‘সুরাজ’-এর অংশভাগী হতে তাৎমা সমাজের পঞ্চরো পরামর্শ করে প্রতি রবিবার তারা কোনো কাজ করবে না। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিতেই জীবনধারণ করা ঢোঁড়াই পঞ্চদের কাছে আবেদন জানায় “ আমাদের পেট কেটো না মহতো। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার।”^{১৫}

পঞ্চদের থেকে প্রত্যুত্তর আসে- “তুই আবার কষ্ট নিয়ে ভকত হয়েছিস না? গান্ধী বাওয়া বড় না তোর রোজগার বড়!” (এ)

এই দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ঢোঁড়াই কিছুতেই বুঝতে পারে না, “...গান্ধী বাওয়া তো তারই দলের লোক। কিন্তু নিজের ‘পেট কেটে’ গান্ধী বাওয়া করা। এটা সে বুঝতে পারে না।” (এ)

ঢোঁড়াইয়ের মতো পাঠকদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় বই কি!

‘গানহী বাওয়া’ করতে তাৎমা সমাজের দীর্ঘদিনের রীতিতেও বদল আনার কথা ভাবে তাৎমাটুলির পঞ্চেরা। যেখানে ‘ঝোটাহা’ (জ্বীলোক) –রা বছরে একবার স্নান করত, সেখানে তাদের মাসে একবার করে স্নান করার হুকুম জারি হয় পঞ্চগয়েত থেকে।

“টোঁড়াইচরিত মানস” তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’-এর অনুকৃতি বটে, কিন্তু রাম-সন্দর্ভের পাশাপাশি ‘টোঁড়াইচরিত মানস’ একরকম প্রতি-সন্দর্ভ নির্মাণ করে। আর তাই সতীনাথের পাঠ্যে মক্-ফাইট (mock-fight) রূপ একটি স্বতন্ত্র বিন্যাস তৈরি করে নেয়।

‘রোজা,রোজগার,রামায়ণ’ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা তাৎমা সমাজে সন্ন্যাসী বৌকা বাওয়ার একটি বিশেষ স্থান আছে। আর তাই তাঁর ভকত হওয়া একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় এই তাৎমা সমাজে। সেজন্যই তাৎমাদের পঞ্চদের মহতো ও ছড়িদার নায়েব ‘বৌকা বাওয়ার’ ভক্ত হতে চায়। কারণ “...এর বদলে যে পাবে অনেক কিছু। লোকের চোখে বড় হয়ে যাবে। এখনই, মহতো, ছড়িদার নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকে অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না... খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটু মজবুত করতে চায়। বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতোগিরি থেকে বেশ দু’পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে তার সমাজে পসার প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে; চাইকি সে তার আগের মহতো নুনুলালের সমান হয়ে যেতে পারে খ্যাতিতে।” (ঝোটাহা উদ্ধার)

অন্যদিকে কুমড়োতে আসা ‘গানহী বাওয়া’-র অন্তিম পরিণতিও কথক আমাদের জানিয়েছিলেন।- “...পরের দিন সকালে কুমড়োটাকে কাপড় ঢেকে গুণী চলে যায় মেলায়। অনেক দিনের মদের খরচ সে রোজগার করেছিল যাত্রীদের কাছ থেকে ঐ মূর্ততা দেখিয়ে। একটা করে পয়সা দিলেই, কাপড়ের ঢাকা তুলে কুমড়োটাকে দেখাত।”(গানহীবাওয়ার বার্তা)

সুতরাং, গান্ধী আদর্শকে আত্মশুদ্ধির বদলে অর্থ উপার্জনের, সমাজে প্রতিপত্তি লাভের সহজ উপায় হিসাবে প্রতিপাদ্য হতে দেখি। কিন্তু গান্ধী আদর্শের নামে এই সুবিধাবাদী, স্বার্থপর অবয়বটি ভেঙ্গে পড়ে পাঠেরই ভিতরে দ্বন্দ্বশীল mock-fight ভাষ্যে:

“রবিবারের দিন দুপুরে মহতোর দল গিয়েছিল, নতুন তুলসীর মালা দেখাতে ধাঙড়টুলিতে। ... শুয়ারখোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গানহী বাওয়ার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন ‘ভকত’। গিয়েই তাদের বলে যে, তোদের শুয়ার-মুর্গী ছাড়তে হবে-গানহী বাওয়ার হুকুম। মাস্টারসাবও সসুরার (শ্বশুরবাড়ি; এখানে জেলখানা) থেকে বেরিয়ে বলেছে।

জয়সোয়াল সোডা কোম্পানিতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে ফোকলা দাঁতে হেসেই কুটিকুটি। আরে গানহী বাওয়া তোদের ‘খত’ (চিঠি) দিয়েছে নাকিরে? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল, তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙড় বলে- ‘লে ডিগি ডিগি! তাই বল! মহতো ‘ভকত’ হয়েছিস। ছড়িদারও দেখছি তাই। ‘বিলি ভকত আর বগুলা ভকত’ (বিড়াল তপস্বী আর বকধার্মিক)। তাই গানহী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশুও তো ছড়িদারকে ‘কলালীতে’ (মদের দোকান) দেখেছি সাঁবের পর।’

‘মিছে কথা বলিস না খবরদার! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবা।’

‘আয় না মরদ দেখি।’

এতোয়ারী শনিচরাকে চুপ করতে বলে দেয় যে, সাহেব-মেমদের কাছে শুয়োরের মাংস, আর মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমাদের ‘পেট কাটেন’, তাহলে তিনি তাদেরই থাকুন। আর ‘পচই’ আমাদের পুজোয় লাগে তাও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব ‘বাবুভাইয়া’ লোক। তাদের যা করা সাজে আমাদের তা করা সাজে না। ঐ যে সেবার ‘টুরমন’-এর তামাশা (১৯১৭ সালে জিরানিয়াতে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচারের জন্য কয়েকদিনের ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট হয়েছিল) হল বিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে রংরেজ-জার্মান লড়াই (ইংরেজ জার্মানদের মক্-ফাইট) হল; - আমাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল? তাদের যেতে দিয়েছিল? ‘গিরানী’-র দোকানের (যুদ্ধের সময়ে সস্তায় চাল দেওয়া হত সরকারি গুদাম থেকে) সস্তা চাল, তাদের দিত সে সময়? এস ডি ও সাহেবের সরকারি কাছারির দোকানের ‘লাটুমার’, আর পেয়ারা মার্কা ‘রৈলী’(লাটু মার্কা আর পেয়ারা মার্কা র্যালি ব্রাদার্সের কাপড়) আমাদের দিয়েছে কোনোদিন?” (তাৎমা ধাঙড় সংবাদ)

সুতরাং, শনিচরা, এতোয়ারীর জীবন জীবিকার ওপর রাজনৈতিক মোড়কে পরিবেশিত ধর্মের অনুশাসন মেনে নিতে রাজি নয়।

এতোয়ারী ‘তামাসা’ কথাটি এখানে ব্যবহার করেছে যে তামাসায় ধাঙড়টুলি কিংবা তাৎমাটুলির, তাদের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের অধিকার নেই। শহুরে ‘বাবুভাইয়া’ আর তাদের মতো নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের পার্থক্যকে সূচিত করে তোলে।

গান্ধীজির রাজনীতির রূপ, নিম্নবর্গের মানুষের কাছে যেভাবে পৌঁছেছে, গোটা পাঠে তার একটা বড় জায়গা আছে। ‘সুরাজ’ কীভাবে এইসব নিম্নবর্গ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সমাজ তাদের ছোট ছোট বেঁচে থাকাগুলোকে গ্রাস করে নেয়, ‘ইউনিফর্মড’ কর নিতে চায় নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী, সতীনাথের পাঠে তা বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

স্বরাজের জন্য বৌকা বাওয়াকে ছেড়ে দিতে হয় তামাকের নেশা।

“বাওয়া তার নিজের কঙ্কেটা ঢোঁড়াইকে চড়িয়ে দিল মহতোর বাড়ির পাশের ‘বরহমভূতবালা বেলগাছটায়” আর তার প্রতিক্রিয়ায় “ ... তামাক না খেয়ে সেদিন বাওয়ার কি ছটফটানি। ... ঢোঁড়াইয়ের বড় মায়া হয় বাওয়ার উপর! নিশ্চয়ই গা হাতপা আনচান করছে।” (ঝোটাহা উদ্ধার)

শাহিদ আমিন সংগৃহীত গান্ধীজি সম্পর্কে সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের মতোই খানিকটা, ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়া বক্তব্য পেশ করে মহতো।

“... তামাক বিড়ি না খেলে এক ঘন্টাও চলে না। বুঝি অতি খারাপ জিনিস তামাক। তার উপর আজকাল আবার শুনছি অনেক জায়গায় গরুর রোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে তামাকে... বলে সে বার কয়েক বেদম খুতু ফেলে- যেন তার গলায় একটা রোঁয়া তখনও লেগে রয়েছে...” (ঐ)

তাৎমা সমাজের পঞ্চগয়েতের অন্যতম মাতব্বর ‘ছড়িদার’ও ধর্মের কুলোয় খানিক বাতাস দেয়।

“...রামজীর দেওয়া শরীর, তামাক পাতা দিয়ে তৈরি কোনো রকম জিনিস, নিতে চায় না। খয়নি খাও...খুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে, নস্যি নাও, নাক ঝেড়ে ফেলতে হবে, জর্দা খাও, পানের পিচ ফেলতে হবে; তামাক সিগ্রেট খাও, ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে হবে।” (ঐ)

কিন্তু শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়

“...এ হারামজাদার নেশা কিন্তু-ছাড়তে-পারব না!’ (ঐ)

রামের দেওয়া শরীর তামাক নেয় না, বলা ভালো গান্ধীজির ‘সুরাজ’ তামাক নিতে দেয় না এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের। কিন্তু রুজি-রোজগারের নিশ্চয়তা কিংবা সামাজিক মানোন্নয়নের কোন স্থায়ী সমাধানও তো দিতে পারে না এ ‘সুরাজ’।

জীবনের হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যেও রামায়নজীর এই ভক্ত পরাধীন ভারতবর্ষের রামচন্দ্র ‘গানহী বাওয়া’র ‘সুরাজ’কে ভালোবেসে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বরাজ আদায়ের কর্মযজ্ঞে। লড়াই ঢোঁড়াইয়ের ভিতরে-বাইরে। কখনও সমাজ, কখনও ব্যক্তি, কখনও বা নিজের দ্বৈত সত্ত্বার সঙ্গেই। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এ লড়াই ঢোঁড়াইকে মহাকাব্যিক দৃঢ়তা দান করেছে।

তাই তার ও বৌকা বাওয়ার রোজগারের ‘পেট কাটলে’ রাগটা গিয়ে পড়ে পঞ্চগয়েতের ধনুয়া মহতো ও বাবুলালের উপর।

“ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে।” (তাৎমা ধাঙড় সংবাদ)

আর তাই বুঝতে চাওয়ার সদিচ্ছাতেই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার মধ্যে দিয়ে ঘটে চোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন। জীবনধারণের জন্য নতুন জীবিকায় পদার্পণ করে সমাজের পঞ্চদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপটি করে চোঁড়াই, তার নতুন কাজের ব্যাপারে না জানিয়ে। ধাঙড়দের এই নতুন ‘বাচ্চা বেলদার’ জানায়;

“আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটিকাটার কাজ করতে দেবে না।”

আর চোঁড়াই তাদের সমাজের নীতি খেলাপ করলে চোঁড়াই সম্পর্কে পঞ্চদের প্রতিক্রিয়া;

“...সেই কুত্তার বাচ্চাটা কিনা মাটি কাটার কাজ করবে; যা আমাদের সাত পুরুষে কেউ কোনোদিন করেনি! তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল। এর থেকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভালো ছিল। ... পয়সা না থাক একটা ইজ্জত, প্রতিষ্ঠা আছে। একটা ছোঁড়ার বদ খেয়ালের জন্য আমাদের সেটাও খোয়াতে হবে?”(মহতো নায়েবের আদি মন্ত্রণা)

চোঁড়াইয়ের এ ধরনের ‘সমাজবিরোধী (!) কাজের জন্য ‘পঞ্চগয়তি’তে চোঁড়াইয়ের ডাক পড়ে। কিন্তু সেই ‘পঞ্চগয়তি’তে চোঁড়াইয়ের অনুপস্থিতি তাৎমা সমাজের পঞ্চগয়েতি গৌরবে আঘাত হানো। কেন না-

“পঞ্চরা কখনও দেখিনি যে, জাতের ‘পঞ্চগয়তি’তে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে আর সে আসেনি। কথায় বলে ‘পঞ্চ’ যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকলে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার! এত বুকুর পাটা যে এঁ একরত্তি ছেলেটার! এ অপমান পঞ্চদের কাছে অসহ্য।”(এঁ)

অতএব চোঁড়াইয়ের উপরের সব রাগ গিয়ে পড়ে বৌকা বাওয়ার উপর। চোঁড়াইকে গোসাঁইখানে না পেয়ে বীরপুঙ্গবের দল আঙুন লাগিয়ে দেয় বৌকা বাওয়ার ঘরের চালায়।

আখ্যানের অগ্রগতিতে বৌকা বাওয়ার ঘরের চালায় আঙুন লাগানোর বিষয়টি এতোয়ারীর উদ্যোগে থানা দারোগা অন্দি গড়ালে চোঁড়াই বুঝতে পারে তাৎমাটুলির “এতগুলো লোকের ভবিষ্যত এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোকটির পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে-যাতে তারা চোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।” (পুলিশের নামে চোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়)

কিন্তু বৌকা বাওয়া ‘কনৌজি তন্দ্রিমা ছত্রি’দের গৌরব সম্পর্কে সচেতন। তাই ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হলেও তার মন কিছুতেই সায় দেয় না ‘ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত’ খাওয়াতে।

সুতরাং, তাৎমা সমাজের এই যে মূল্যবোধের ভাঙন, একদিকে রোজগারের সঙ্গে ঐতিহ্যের সংঘাত, অন্যদিকে ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে চিরাচরিত ভাঙন, তার সাথেই ভাঙন রোধেরও প্রচেষ্টা, মিলেমিশে হাত ধরাধরি করে চলে।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে দেখা যায় পঞ্চসহ গোটা তাৎমাটুলির মানুষ ঢোঁড়াইকে বেশ সম্ভে চলতে থাকে। কিন্তু ‘পঞ্চগয়তি’র মাতব্বররা ঢোঁড়াইকৃত তাদের অপমানিত হওয়ার কথা যে ভুলে যায়নি, তার উদ্ভাসন দেখা যায় রাবিয়া-ঢোঁড়াই-এর বিবাহ পরবর্তী কলহ নিরসনের সালিশি সভায়। পঞ্চগয়েতের বিচারে রাবিয়া ঢোঁড়াইয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ, আর সেই সঙ্গে রাবিয়ার নতুন করে ‘সাগাই’ (বিবাহ) দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

শৈশব থেকেই মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ঢোঁড়াই।

“মেয়েমানুষের উপর সে আগে ছিল একটু নিস্পৃহ গোছের, নিস্পৃহ কেন, বোধহয় একটু বিরক্ত বিরক্তই...কিন্তু এ মেয়েটা (রামিয়া) কেমন যেন অন্যরকম। কথা বলে যেন কত কালের চেনা...” (ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন)

সাময়িক উত্তেজনার বশে, শারীরিক নিগ্রহ করার জন্য সেই ‘কত কালের চেনা’, যাকে নিয়ে বাস্তব-কল্পনার মিশেলে সংসার যাপনের কত ছবিই না সে এঁকেছিল, সেই রামিয়াকে ছেড়ে ঢোঁড়াইকে পাড়ি দিতে হয় ‘পাক্কীর পথ’ ধরে কোনো এক অজানা গন্তব্যে। মানসিক এই যন্ত্রণার আবহেই কথক শেষ করেন ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ এর প্রথম চরণ।

‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এর দ্বিতীয় চরণ শুরু হয় বিচ্ছেদের খেদ পেরোনো ঢোঁড়াইয়ের সেই বিচ্ছেদের অসামান্য খেদ দিয়ে। ঢোঁড়াই ‘পাক্কী’র পথ ধরে পৌঁছয় আখ্যানের পরবর্তী পটভূমিতে। ‘কুশবাহাছত্রি’ ওরফে কোয়েরীরা বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর, তাদের নিজস্ব কোনো জমি জিরেত নেই। কিন্তু অধিকাংশই রাজপুতটোলার রাজপুতদের ‘আধিয়ার’। বাড়ির মহিলারা বংশানুক্রমে ঝি-চাকরের কাজ করে।

“ আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপারভাঙা ... আইনের চোখে যাই হোক, আসলে কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বচন সিং- গাঁয়ের ‘বাবুসাহেব’। জেতে আর রায়তি জমি মিলিয়ে এঁর জমি হবে প্রায় তিন হাজার বিঘা। কিন্তু ইনি নিজেকে বলেন ‘কিসান’। ...‘সার্কিলে’ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ‘মজকুরী সেপাই’ এর পদে বহাল হন। ... সেই মজকুরী সেপাই কেমন করে আস্তে আস্তে এখানকার বাবুসাহেব হয়ে গেলেন, সেটা এদিককার প্রতি গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস। তার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই।”(মোসম্মতের খেদ)

এ হেন ‘গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস’ -এর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ঢোঁড়াই। কিছু জমির মালিক মোসম্মতের মৃত জামাইয়ের ভাই ‘গিধর মন্ডল’ (গিরিধারী মন্ডল)-এর সহযোগিতায় মোসম্মতের তামাক খেতের চাষকার্যে বহাল হয় ঢোঁড়াই। সেখানে মোসম্মত, মোসম্মতের মেয়ে সাগিয়ার সাহচর্যে “দুনিয়াটার আগাগোড়াই ‘ভিতরসুন্না’। ভাল কিছু নেই” এই বোধ থেকে “এখনও তাহলে মরলে কুকুর-শিয়ালে টেনে নিয়ে যাবে না। এখানেও তাহলে মিষ্টি কথা বলবার লোক আছে”-এই বোধে সে উন্নীত হয়।

যেহেতু, এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক আবর্তটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি, সেহেতু চোঁড়াইয়ের যাপনের মূল রাজনৈতিক বাঁকগুলোকে ধরার চেষ্টা করব।

বিসকাঙ্কার এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর দারিদ্রতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছোয়, যখন ‘পয়সার আকালটা...ধানের আকালে বদলে’ যায়। আর এই দারিদ্রতার সাথেই আঞ্চলিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বয়ান জুড়ে যেতে থাকে আখ্যানের শরীরে।

“...বড় কিষাণদের বাড়ি ধান আছে। ...পুরনো ধানে বাবুসাহেবের আটটা পাঁচশমণী গোলা ভরা। না চাইলেও যে ধানটা আসবে, সেইটা রাখার জায়গা করাই শক্ত।”

এই অর্থনৈতিক বৈষম্য নাড়া দেয় চোঁড়াইকে। সে তার নিজের সমাজের পঞ্চদের বিরুদ্ধে সত্যের জন্য লড়েছিল, রুজি-রোজগারের স্বাধীকারের পক্ষে লড়েছিল। হতদরিদ্র ‘আখিয়ার’দের উপর ‘বাবুসাহেব’দেরই অর্থনৈতিক শোষণ রামায়ণজীর ভক্তকে রামরাজ্যের অনাচার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ন্যায়ের জন্য, হক আদায়ের দাবীতে আর একবার চোঁড়াই কোয়েরীদের নিয়ে জোতদার ‘বাবুসাহেব’দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

কোন জোর-জবরদস্তি নয়, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ধান গোমস্তার সামনে মেপেই টিপসই দিয়ে ধান নেওয়া আর চাষের পর সেই ধান থেকে হিসাব মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী চোঁড়াই। এরকম সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হয় শোষক শ্রেণি। কোয়েরীদের বড়হাদাদার উপরে বাবুসাহেবের ছেলের যে অত্যাচার, তা কোয়েরীদের সংগঠিত হতে অনুঘটকের কাজ করে।

শোষক সাময়িক পিছু হটলেও নানা ফন্দি-ফিকির অবলম্বনের মাধ্যমে সুযোগ বুঝে আক্রমণ শানায় শোষিতের উপর। এই আখ্যানে আমরা তেমনটাই দেখতে পাই। শাসকের ধর্ম নেই, শোষণই তার ধর্ম। আর তাই শোষণ প্রক্রিয়াটিকে চালু রাখতে গেলে শোষিতের শ্রী-বৃদ্ধি তথা সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি তার কাছে অসহ্য, চোখের বালি।

এই আখ্যানে রাজপুত্র বচ্চন সিং-এর শোষণের দোসর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউন্ডকীপার ইনসান আলি।

“...বাবুসাহেবের টাকা দিয়েই সে খোঁয়াড় নিয়েছে, নিলাম ডেকে। ‘মোসম্মতের ক্ষেতে গরুমোষ রাতে ছাড়লেই তিনদিনের মধ্যে কাবু হয়ে যাবে। হুকুর (হুজুর)। ঝোলাগুড় দিয়েই যদি মাছি মরে, তবে বিষ দেওয়ার দরকার কী।”(বাবুসাহেবের কটক সঞ্চারণ)

আর এই ঝোলাগুড় দিয়ে মাছি মারার উপায়টি হল আখিয়ারদের ধানখেতে বাবুসাহেবের বলদগুলোকে রাতের অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া, যাতে করে জমির ফসল নষ্ট করে তাদের ঋণ পরিশোধ করার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া যায়।

দীর্ঘদিনের অবিচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা কৃষকদের বিদ্রোহী মানসিকতার মূলে আঘাত করতে বাবুসাহেব বেশ কিছু রায়তের বিরুদ্ধে বাকি খাজনার নালিশ ঠোকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সংঘটিত হতে থাকে বিসকাঙ্কার কোয়েরীদের ক্ষোভ, টোঁড়াই যার অগ্রভাগে থাকে। তারাও প্রস্তুতি নেয়। আর সেই প্রস্তুতির অংশস্বরূপ ‘ভারি চোখা বুদ্ধির লোক’, যে কিনা ‘বালিস্টরকেও (ব্যারিস্টার) হারিয়ে দেয়’, এ হেন রামনেওয়াজ মুন্সীর কাছে তারা যায়। আর কথকের বিবরণে আইনের পরিহাসটি গোপন থাকে না। টোঁড়াই দেখে রামায়ণজীর রাজ্যে ন্যায় বিচারের দাম- “...প্রথম দিনই লাগবে ছাব্বিশ টাকা। লম্বা তারিখ চাও তো আরও চার টাকা বেশি। ...’না, না। এক পয়সা কম হবে না। ...তোমরা খরচ করতে না পার, বাবুসাহেব লুফে নেবে রামনেওয়াজ মুন্সীকে। তোমরাও যেমন পাবলিক, বাবুসাহেবও সেইরকম পাবলিকের বাইরে নয়।” (টোঁড়াইয়ের অমৃত ফল লাভ)

অর্থাৎ, ন্যায়বিচারের পালা সেই দিকে তত ভারী, যদিকে অর্থখরচ করার প্রাবল্য বেশি, সে হোক না অন্যায়কারী, শঠ কিংবা প্রবঞ্চক। ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই আসল উদ্দেশ্য। বিচারের পদ্ধতি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহসনের নামান্তর, সতীনাথ উপরিউক্ত ঘটনার আলোকে বিচারব্যবস্থার নামে প্রহসনের সেই চালচিত্রটি তুলে ধরেন পাঠকের সামনে।

সতীনাথের পাঠে ক্ষমতামতালীদের সুবিধাবাদী সহাবস্থানও পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বৃদ্ধা মোসম্মত, যে বাবুসাহেবের সর্বগ্রাসী জমিগ্রামের দৃষ্টি বাঁচিয়ে তার সম্পত্তি আগলে রেখেছিল, সেই মোসম্মতের জমি আর তার মেয়ে সাগিয়াকে ‘চুমৌনা’(বিবাহ) করার অভিপ্রায়ে গিধর মন্ডলের যে কার্যকলাপ, অশুভ শক্তির সঙ্গে তাঁর যে আঁতাত, সেটির চিত্রও উঠে আসে।

গ্রামাঞ্চলের মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রতিহত করতে তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাদের বিশ্বাসী লোক, যারা সরকারকে সহযোগিতা করবে, এজন্য সর্বত্র ‘আমনসভা’ তৈরি করার পরিকল্পনা করে সরকার।

গান্ধী আদর্শ নিয়ে সর্বত্র যে জুয়াখেলা চলেছে এমনটা নয়। কেউ কেউ গান্ধী আদর্শের ব্যবহারিক দিকটির সত্যানুসন্ধানেও ব্রতী ছিলেন। গান্ধীজির আন্দোলনে “তিন সাল ‘হয়ে আসা’ ভোপতলাল চরিত্রটি সেইরকমই একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র। যে “ মিটিনে...উঠে প্রস্তাব করে যে, যার আয় একশ টাকার উপরে সে যেন আমনসভার মেম্বার না হতে পারে।” (গিধরের সঙ্গে বাবুসাহেবের মিতালি)

গরীব মানুষগুলি অবাক হয়, কারণ ক্ষমতা হস্তগত করার যে রাজনীতিটা তারা দেখে এসেছেন তার সঙ্গে ভোপতলালের বক্তব্যকে তারা মেলাতে পারেন না বলে। কারণ “ বাইরে বাইরে ইংরাজের দিকে, ভিতরে ভিতরে মহাৎমাজির দিকে, আর সব সময় নিজের দিকে; এই তো দেখি সবাই। এ ছোকরা দারোগা আর সার্কেল ম্যানেজারের সম্মুখে নিজের দিকের কথাটা একেবারেই ভাবলই না!” (গিধরের সহিত বাবুসাহেবের মিতালি)

কিন্তু ‘দারোগাসাহেবের ভিতরে ভিতরে ঠিক’ করা রাজপারডাঙার সার্কেল ম্যানেজারই হয় ‘আমনসভা’-র সভাপতি আর গ্রাম-আমনসভার ‘মুখিয়া’ (সেক্রেটারি গোছের) হয় গিধর মণ্ডল। সুতরাং, সাধারণ মানুষের কী চাহিদা, এক্ষেত্রে তা মুখ্য নয়। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষগুলোই ঠিক করে দেয় সাধারণ মানুষের নেতৃত্বকে!

শোষণতন্ত্র যেমন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্মিলনে তার শোষণযন্ত্রটিকে সক্রিয় রাখে। এ আখ্যানেও রাজপুত বচন সিং আর ‘মুখিয়া’ নামক ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখা গিধর মণ্ডল পরস্পরের সহযোগিতায় তাদের সেই সুবিধাবাদী অবস্থানটিকে আরও শক্ত-পোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চায়। তাই “...জাতের ইজ্জত ভুলে গিধর মণ্ডলটার সঙ্গে ‘হাত মিলিয়েছিল’ বচন সিং নিজে উপযাচক হয়ে।

আর গিধর মণ্ডল জানে যে, ঢোঁড়াইটাকে শায়েস্তা করতে হলে, রাজপুতদের সাহায্য বিনা উপায় নেই।” (গিধরের সহিত বাবুসাহেবের মিতালি)

সুতরাং, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এ বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল। ঢোঁড়াইয়ের মাটিকাটার কাজ করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে বিরোধিতা করতে গিয়ে তাৎমাটুলির পঞ্চেরা বলেছিল বটে, “ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবি হয় টোলার।” (মহতো নায়েব আদি মন্ত্রণা)

কিন্তু বদলে যাওয়া সময়, বদলে যাওয়া মূল্যবোধে আমরা দেখতে পাই, মানুষ কেবল অর্থের। আর সেই অর্থের জোরেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার।

১৯৩৪-এ বিহারের পূর্ণিয়ার ভূমিকম্প এবং সেখানে গান্ধীজির যাওয়ার মতো ঐতিহাসিক ঘটনা সতীনাথের আখ্যানে জায়গা করে নিয়েছে। আর তার সঙ্গেই জুড়ে যায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে আঞ্চলিক নেতৃবর্গের রাজনীতিও। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে ঢোঁড়াইদের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের যে আঞ্চলিক রাজনীতি, তার মধ্যকার যে সংঘাত, তা এই ঐতিহাসিক আখ্যান ধারণ করে রাখে। গান্ধীজি পূর্ণিয়ার ভূমিকম্পের কারণ দর্শাতে গিয়ে মন্তব্য করেন, “...পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে। ...অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায্য করি। তাদের মানুষ বলে ভাবিনা। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সহিতে পারেননি।”...

কথাটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। রাজপুতদের পাপের কথা কি তাহলে ভুল? তাৎমাটুলির মোড়লদের পাপের কি তাহলে ওজন নেই।” (পাপ ক্ষয়ের উপায় কখন)

গান্ধীজীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঢোঁড়াইয়ের মতো মানুষদের এ রকম ভাবনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথাও নেই; যদি একটু তলিয়ে দেখি। ঢোঁড়াইদের কাছে পৃথিবী তথা বহির্বিশ্ব আলাদা কোনো তাৎপর্য তৈরি করে না। যেমনভাবে বিভূতিভূষণের ভানুমতীদের করেনি। প্রতিদিনকার সংগ্রামী বেঁচে থাকা, ছোট ছোট সংঘাত, ভালোবাসা, অসন্তোষ এই নিয়েই তাদের জীবন। ভানুমতীদের বাসস্থান বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির মতোই তাৎমাটুলি কিংবা বিসকাঙ্কাই ঢোঁড়াইদের দেশ, আর পঞ্চায়েত কিংবা জোতদারদের নিপীড়নই তাদের কাছে বৃহত্তর সামাজিক আক্রমণ। সুতরাং পাপেই এই মাত্রাগত পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

ভূমিকম্পের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কংগ্রেসের তহবিল থেকে ‘রিলিফ’ এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তা পায় না কোয়ারীটোলার গরীব মানুষরা। কিন্তু বাবুসাহেবের জন্য বিশাল অঙ্কের ‘রিলিফ’ জোটে, তারই পুত্র ‘কাংগ্রিস’ (কংগ্রেস)-এর লাডলীবাবুর তৎপরতায়। কারণ বুঝতে কোয়েরীটোলার মানুষরা যখন মাস্টারসাহেবের কাছে যান, তখন তাদের যে ‘রিপোর্ট’ (রিপোর্ট) পড়ে শোনান, তাতে লেখা থাকে:

“...কোয়েরীটোলায় গিধর মন্ডল ছাড়া আর সকলেরই খড়ের ঘর। খড়ের ঘরগুলির ভূমিকম্প বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কেবল সে ঘরগুলির মধ্যে দিয়ে ফাটল গিয়েছিল তার বেড়াগুলো হেলে পড়েছিল। সে সব কোয়ারীরা নিজেরাই মেরামত করে নেয়। ...গ্রামের আসল ক্ষতি হয়েছে পাকা দালানগুলির। ক্ষতির পরিমাণের ফিরিস্তি পরে দেওয়া আছে। ঐ পরিমাণ রিলিফ এদের দেওয়া উচিত। কোয়েরীটোলায় এক গিধর ওরফে গিরিধারী মন্ডল ছাড়া বাকি সব ক্ষতিগ্রস্ত ইটের বাড়িই রাজপুতটোলায়। কোয়েরীটোলার যে জমিগুলিতে বালি উঠেছিল সেগুলি তারা আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছে। ইঁদারার বালি ছাঁকবার জন্যও তারা পরমুখাপেক্ষী নয়। এর জন্য তারা সত্যই প্রশংসার পাত্র। এখানকার ইঁদারাটির পাট কয়েক জায়গায় ফেটে গিয়েছে। তবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি টিউবওয়েল কোয়েরীটোলার মধ্যে থাকায়, গরমের সময় লোকের অসুবিধা হয়নি। জমিগুলি থেকে বালি সরানো হলেও কিছু কিছু বালি থেকে গিয়েছে। ঐসব জমিতে চিনাবাদাম লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। ... রাজপুতটোলায় একটি নতুন ইঁদারা দেওয়া উচিত। তাদের সব পাকা ইঁদারাগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছে। সাঁওতালটোলায় ক্ষতি কিছুই হয়নি। তারা বালিতে গর্ত খুঁড়ে যে জল বেরোয় তাই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে। ভূমিকম্প রিলিফের টাকা থেকে সাঁওতালটোলার জন্য একটা ইঁদারা কিম্বা টিউবওয়েল করিয়ে দিলে, ঐ টাকার অপব্যয় করা হবে না বলে আমার ধারণা।”(কোয়েরীদের নিদ্রাভঙ্গ)

ঢোঁড়াইয়ের যাপনে, জীবনসংগ্রামে মাঝে মাঝে রামায়ণজীর ন্যায়বিচার সম্পর্কে সন্দেহ উঁকি দিলেও, তাকে দানা বাঁধতে দেয়নি ঢোঁড়াই। বরং নিজেরই ভুল বিবেচনা করে দ্বিগুণ আগ্রহে এগিয়ে গেছে সত্যাস্বেষণে। ‘গান্ধী বাওয়া’-কে এ যুগের (স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের) রামায়ণজী মেনেছে ঢোঁড়াই, আর তার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হওয়ার সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব খোয়ানো হৃদয়ের বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে। ঢোঁড়াইয়ের

মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণটি দৃষ্টি এড়াইনি ‘মহাত্মাজির চেলা’, ‘কংগ্রেসের বলন্টিয়র’ দের। আর সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে ওঠে তারা।

আজন্ম লালিত রামভক্তির সংস্কার কিংবা অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত ‘গানহী বাওয়া’র প্রতি শ্রদ্ধা, যা থেকেই হোক না কেন, সব হারানো চোঁড়াই ‘গানহী বাওয়া’র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে জড়িয়ে পড়তে চেয়েছিল। বক্তব্যে একটু ভুল থেকে গেল। একটা স্বার্থ ছিল অবশ্য চোঁড়াইয়ের। ‘গানহী বাওয়া’র কর্মযজ্ঞের রামায়ণের ‘কাঠবিড়ালী’র ভূমিকাটুকু পালন করবে।

আখ্যানের অগ্রগতিতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বিসকাঙ্কাতেও ‘বোট’ (ভোট)-এর তৎপরতায় গান্ধীজির চেলাদের দৌরাণ্য বাড়ে। কোয়েরীদের মতো তাদের অঘোষিত নেতা চোঁড়াইও ঠিক বুঝতে পারেনা ‘বোট’ বিষয়টি ঠিক কি! বলন্টিয়ররা কেবল জানান দেয় যে, ভোট দিলে সেই ভোটদাতাদের প্রত্যেকেই একটা করে চিঠি পাবে গান্ধীজীর।

“...মহাত্মাজীর কাছ থেকে চোঁড়াইয়ের নামে একখানা চিঠি আনিতে দিতে রাজি হয় বলন্টিয়ররা, যদি চোঁড়াই তাদের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গাঁয়ে মহাত্মাজীর গান গেয়ে বেড়ায়। আপনার গানের গলাটা বেশ...সেই ‘বোট’ এর দিন চিঠি দেব।” (রামরাজ্য আনয়নার্থে যজ্ঞ)

এজন্য বলন্টিয়রদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই চোঁড়াইয়ের। কিন্তু ভোট সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কোন পরিবর্তনই সূচিত করে তুলতে পারে না চোঁড়াইদের জীবনে। তাদের সমস্যা সেই তিমিরেই থেকে যায়, কোনো সমাধান সূত্রের সন্ধান তারা পায় না। বরং আশঙ্কায় দিন গোনে কবে বাবুসাহেব তাদের জমি থেকে ‘আধিয়ারদের’ হঠিয়ে দেবে। বলন্টিয়রের দেওয়া ‘ফারম’ (ফর্ম) পূরণ এবং সেই সঙ্গে রামরাজ্যে কৃষকদের ওপর এ ধরনের অনাচার যে আর চলবে না, এমন অভয়বাণীর পরও ‘বাপদাদার করা জমিটাও রাখতে পারেনি’ তারা। কারণ ক্ষমতাসালীদের চতুর, গোপন বোঝাপড়া তারা বুঝতে পারেনি, যে বোঝাপড়ার সুবাদেঃ

“...বাবুসাহেব ‘কিসান’ (রায়তী-স্বত্বধারী লোক)। তারা শুধু বুঝেছিল গান্ধীজিকে। যার নেতৃত্বে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যান্যের সুবিচার হবে, কানুন তাদের পক্ষে যাবে। সেজন্যই এমন হতাশাব্যঞ্জক ঘটনায় খেই হারিয়ে ফেলে চোঁড়াই, মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, “মহাত্মাজীর কানুন কলস্টরসাহেব বদলে দিল! কলস্টরসাহেব কি মহাত্মাজীর থেকেও বড়?” (ঐ)

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা দেখি, গান্ধী মহাত্ম্যে এবং বলন্টিয়রের প্ররোচনায় চোঁড়াই ‘আজাদ দস্তা’ (স্বাধীন দল)-য় নাম লেখায়। এই ক্রান্তিদলে গিয়ে চোঁড়াই নতুন নাম পায়, “তার নাম হয়েছে ‘রামায়ণজী’। সর্দারই প্রস্তাব

করে। গান্ধীর এ নামে আপত্তি ছিল। সে বলেছিল যে, এখনও অনেক লিডারের ভাল ভাল নাম বাকি রয়েছে। ক্রান্তিদলে আবার রামায়ণ টামায়ণ আনা কেন? কিন্তু তার কথা টেকেনি।” (ক্রান্তিদলে ঢোঁড়াইয়ের নূতন নামকরণ)

আর এই ‘আজাদ দস্তা’র স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সতীনাথ কি নির্ভেজাল কৌতুক আর গ্লেশের মিশেলে:

“...ভিনদেশের রংবেরঙের পাখি লালমুখো কাকতাদুয়া দেখে দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছিল। সাঁঝ পড়াতে এক গাছে রাত কাটাচ্ছে ‘তার নাম আজাদ দস্তা’। বুলিমুখস্থ তোতা আছে, নাচনদার ফিঙ্গে আছে; পাঁকের পাখি কাদাখোঁচা আছে, সবজান্তা ভূশন্তী কাক আছে। ইস্কুলের ছেলেই বেশি। নাম জিজ্ঞাসা করলে নামের সঙ্গে ‘আজাদ’ কথাটা যোগ করে দেয়।

...পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য দলের যোগ্য লোকেরা নতুন নাম পায়। ভোপতলালের নাম হয়েছে গান্ধী, বিশুন্ শুক্লার নাম হয়েছে জওয়াহর, বলন্টিয়জীর নাম প্যাটেল, বাচিতর সিংয়ের নাম আজাদ, মিলিটারি ফেরত লোকটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘সর্দার’। এই নাম পাওয়ার চাইতে বড় সম্মান দলের মধ্যে আর কিছু নেই। এ নিয়ে ঈর্ষা হৃন্দের অন্ত নেই।

...মহাত্মাজীর কাজ মন বদলে দেয় লোকের দেখতে দেখতে। অন্য কাজে কেবল নিজের গাঁয়ের লোকের প্রশংসা পেলেই মন ভরে ওঠে। এ কাজে শুধু ঐটুকুতে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু যে কদর পেতে হলে রামায়ণ-পড়া লোক হতে হয়।” (ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ)

এ হেন ক্রান্তিদল, যেখানে গান্ধী আদর্শের ছিটেফোঁটারও বালাই নেই, সকলে যে যার ব্যক্তিত্ব জাহির করতে সদা তৎপর, সেখানেও ঢোঁড়াই তার কর্মদক্ষতার কোনো খামতি রাখে না। এতদসত্ত্বেও যখন ঢোঁড়াইকে স্বার্থপর, কলহ হৃন্দে জর্জরিত নেতৃত্বের জিজ্ঞাসার মুখে পড়তে হয়, তখন স্পষ্টতই এক হতাশার রূপকল্প ভেসে ওঠে পাঠকের চোখে: “...এই রামায়ণ হাতে করে বলছি। আমার ইমানদারিটুকুতেও যদি সন্দেহ কর তাহলে আমার আর থাকল কী?”

তখন পাঠকও বিদ্ধ হন যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে। কারণ গোটা আখ্যান জুড়ে পাঠক দেখেছে ঢোঁড়াই লড়ে গেছে সত্যের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে। ‘অযোধ্যাজী’র মতোই সত্যে অবিচল থেকেছে সে তার জন্য সে জন্মভূমি হারিয়েছে, সমাজ-প্রিয়জনদের ছেড়েছে, নিজের কোনো প্রাপ্তির আশা না থাকলেও লড়েছে বিসকাঙ্কার কোয়েরীদের জমি উদ্ধার, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, গান্ধীজির রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে তার মতো মানুষের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, তার সবটাই সে করার চেষ্টা করেছে নিষ্ঠা সহকারে। আর তার ‘ইমানদারিটুকুতে’ আজাদ-দস্তার নেতৃত্ব বা সহকর্মীদের অবিশ্বাস ঢোঁড়াইয়ের যাপনের মূল আধারটিকেই আসলে ভেঙে চুরে দিতে চায়। ‘আজাদ-দস্তা’-র সর্দারের কাছে ঢোঁড়াই আবেদন রাখে একখানা ‘রামচরিত মানস’ কিনে আনার। সে

“...রামায়ণখানা হবে তার একেবারে নিজের। ঠিক নিজের জমির মতো, নিজের ছেলের মত। ...” (স্বর্গের সোপানের সন্ধান লাভ)

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মন “...রামায়ণের আড়ালে গিয়েও মনের অস্থিরতা কাটেনা রামায়ণজীর; ওর মধ্যে ডুবে থেকেও মনে বল পায় না। ...একটা সর্বগ্রাসী উদাসীনতার ছায়া পড়েছে মনের ওপর।”

এতদসত্ত্বেও, ক্রান্তিদলে বছর পনেরোর এন্টনি যোগদান করলে “রামজীর কৃপায় রামায়ণজী তার হারানো ধন” ফিরে পায়। ঢোঁড়াইয়ের “মনের আলগা শিকড়গুলো আবার খানিক রসালো মাটির সন্ধান” পায়। ক্রান্তিদলে স্বার্থ নিয়ে দলাদলি ঢোঁড়াইয়ের মনে হতাশার সঞ্চার করেছিল।

তবুও একসময় রামিয়া নেই জানার পর, এন্টনি তার ‘হারানো ধন’ নয় জানতে পেরে ‘নিজের জমির মতো, নিজের ছেলের মতো’ রামায়ণখানা এন্টনির মায়ের ঘরের বারান্দায় রেখে ঢোঁড়াই চলে যায় এস ডি ও সাহেবের কাছে সারেন্ডার করতে।

আখ্যানের আর একটি বিশেষ অংশ পাঠক খেয়াল করবেন হয়তো। সেখানে জ্বর বাড়লে এন্টনির মাথায় ঢোঁড়াইয়ের রামায়ণ ঠেকানোর অংশটি।

“...ছেলেটার একটু তন্দ্রা এলে তার অলক্ষ্যে রামায়ণখানা বার করে তার মাথায় ঠেকিয়ে দেয়। হোক কিরিস্তান। রামচন্দ্রজীর আবার জাতবিচার আছে নাকি। গুহক চন্ডালকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আহা দেখা হয়নি; রামায়ণখানার পাশের দিকে একরকম পোকায় বাসা করেছে, ঠিক ধুনোর মতো চটচটে একটা জিনিস দিয়ে। একেবারে এঁটে গিয়েছে পাতাগুলো। খোলা যায় না। একখান একখান করে খুলতে অনেক সময় লাগবে। ...” (হৃদয় অশ্বেষণের ফল)

কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেই আন্দোলনের কর্মকাণ্ডও ‘পোকায় বাসা’য় পরিণত হওয়ার সাক্ষী থাকেন পাঠক। এর পূর্বে আমরা শাহিদ আমিনের গবেষণার উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি নিম্নবর্গের মানুষের কাছে গান্ধী কিভাবে নির্মিত হচ্ছেন বা বলা ভালো তাঁকে কীভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, তা তথ্য সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে আমরা আর একবার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কীভাবে সমাজবিরোধী, সুবিধাভোগীদের কজায় চলে যায়, তা শাহিদ আমিনের গবেষণা থেকে খানিক বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ সতীনাথের উক্ত আখ্যানেও কংগ্রেসের একাংশের সুবিধাবাদী রাজনীতির সেই রূপটিও উন্মোচিত হয় তীব্র শ্লেষ সহকারে। বিশুনি কেওটের বয়ানে বিবৃত হয় দাগী-আসামীরা তাদের পিঠ বাঁচাতে ক্রান্তিদলকে কীভাবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করে।

“...তোর মাগ ছেলে নেই ঘরে, তবে এই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? পোকার ঘর পোড়ানোর সাজা আর কতদিন হবে; দুখে দম্বল দিয়ে জেলে যাবি, আর ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে সেই দই খাবি। ...বিসুন শুক্লাকে এরা দলের পাভা করেছে কেন জানিস? এখন কাজের মধ্যে তো চাঁদা তোলা কেবল। বিসুন শুক্লা মাস্টারসাহেবের চেলা কিনা, তাই লোকে ভাবে যে টাকাটা মহাত্মাজীর কাজেই লাগবে। দেখলি না ঐ জন্যই তো দল থেকে নিয়ম করে দিয়েছে যে, ওকে বিসুন শুক্লাও বলতে পার, জওয়াহরও বলতে পার। ঐ পঞ্চপাভবের মধ্যে আর কাউকে আসল নাম ধরে ডাকো তো। ...জেলের মধ্যে কত কাণ্ডই দেখেছি এই সব মহাত্মাজীর চেলাদের! ... বিসুন শুক্লা করণজাহা ইউনিয়ন বোর্ড পুড়িয়েছে কেন জানিস তো? টাকা খেয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের। তাই হিসাবের খাতাপত্তরগুলো নষ্ট করে দিল। এই আজাদ দস্তার নামে নেওয়া চাঁদার টাকাও খাবে এই দশভূতে মিলে। এ আমি বলে রেখে দিলাম দেখে নিস। চাঁদা আর বলিস না ওকে। ...” (ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ)

শাহিদ আমিন তাঁর গবেষণায় পাঠকদের এমনই এক ঘটনার সাথে পরিচয় করান। “১৯২১-এর শীতকালে উত্তর বিহারে যে সব হাট লুঠের ঘটনা হয় সে বিষয়ে একজন আমলা লিখেছেনঃ “সরকারের হাতে যা সাক্ষ্য রয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই যে ওই হাট লুঠের ঘটনা আর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। লুঠনকারীরা এসে প্রথমে চাল বা কাপড় বা ওই জাতীয় কোনও জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করে। দাম শুনেই তারা বলে যে গান্ধী হুকুম দিয়েছেন দাম এই হবে, বলে চলতি মূল্যের এক চতুর্থাংশ একটা মূল্য উল্লেখ করে। দোকানি ঐ দামে জিনিস বিক্রি করতে অস্বীকার করলে তাদের গালাগাল আর মারধর করে তাদের দোকান লুট করা হয়।”^{১৬}

রামচন্দ্রের মতোই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সত্যের জন্য লড়াই করে গেছে। গান্ধীজির রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়ে সে তারই মতো নিম্নবর্গের মানুষগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের স্বপ্ন দেখেছে। আর ঢোঁড়াইদের সেই স্বপ্ন কীভাবে হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যায়, তারই এক নির্মম আখ্যান বোনে সতীনাথ। যে আখ্যানে ঢোঁড়াইদের কণ্ঠস্বর থেকেও নেই কোথাও, যেখানে নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস চেতনা বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে উচ্চকোটির চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাস চেতনার সঙ্গে। সমাজের উচ্চবর্গের যে ইতিহাস নির্মাণ সতীনাথ তাকে মুহূর্তে আক্রমণ করেন, তার ভাঁওতাগুলো তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। সতীনাথ নিজে এই উচ্চবর্গের শ্রেণিভুক্ত একজন মানুষ হলেও ‘জাতের বজ্জাতি’ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার সূত্রে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রণজিৎ গুহ তাঁর ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ প্রবন্ধে ‘জাতীয়তাবাদ’ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আসলে কীসের এই জাতীয়তাবাদ, কাদের জন্য এই জাতীয়তাবাদ?

“...তারা (ইংরেজ) এসে তাদের শাসনকে রূপায়িত করল নানা ঔপনিবেশিক সংস্থায়, তা পরিচালনার জন্যে নিয়ম বেঁধে দিল। নিয়ম ভাঙলে কী সাজা হবে তাও ঠিক করে দিল আইন কানুন দিয়ে এবং ওইসব কিছু যাতে

উচ্চবর্ণের বোধগম্য হয় তার জন্যে একটা সংস্কৃতিকেও চালু করে দিল রাষ্ট্রক্ষমতা কায়ম ও বিস্তার করার উদ্দেশ্যে। এইসব সংস্থা ও তৎসংক্রান্ত সংস্কৃতি যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের উপলক্ষ্য ও বিষয় তারই নাম পলিটিকস এবং আলোচ্য ধারাটি অনুযায়ী সেই পলিটিকসে উচ্চবর্ণের দীক্ষিত হওয়ার প্রণালীটির ‘লার্নিং প্রসেস’টিরই নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের এই ব্যাখ্যায় আদর্শনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ জনসেবার স্থান নেই, আছে শুধু ঔপনিবেশিকতার বরে পাওয়া অর্থ যশ ও ক্ষমতার লোভ আর সেই লোভের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর জন্যে ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চবর্ণের মধ্যে এবং শেখোক্তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনীই, এই মতে, জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা।”^{২৭}

সেজন্য ঢোঁড়াইরা কেবলই ব্যবহৃত হয়, তাতে করে জাতীয় রাজনীতির স্বার্থ হয়তো পরিপুষ্ট লাভ করে, কিন্তু ঢোঁড়াইদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় না। বলা ভালো হতে দেওয়া হয় না। সে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। কারণ উচ্চবর্ণ কখনওই চায় না তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষগুলোর রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হোক। তাহলে তো তাদের হাতে তৈরি শ্রেণিস্বার্থের ইমারত ধসে পড়বে তাদের ঘরের মতো। সুতরাং, এই ব্যবধানটুকু ধরে রাখা ভীষণভাবেই প্রয়োজনীয় উচ্চবর্ণের কাছে। ফলত সমাজপ্রগতির যে ধুর্যো তোলেন উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গ, তা কেবল তাদের রাজনীতিকেই শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়। আর নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক সচেতনতাকে ঠেলে ফেলে আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালের স্তূপে। তাই বিভিন্ন সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, দৈবিক অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে সঁধিয়ে যেতে থাকেন নিম্নবর্ণের মানুষগুলো। তাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক ভাষ্য গড়ে উঠতে দেখি না।

“...দেশ তাদের গ্রহণ করেনি, সমাজ তাদের জায়গা দেয়নি এবং পুঁজিবাদের প্রযত্নে বা প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা পাওয়ার-পলিটিকস তাদের নুনঘাম কেবল শুষ্ক নিয়েছে-স্থায়ী বাসভূমির আকল্প দেবার কথা ভাবেনি। ফলে স্বাধীনতা পাবার পরও স্বাধীনতাহীন এক ঔপনিবেশিক পীড়নের হাত থেকে কখনও রেহাই পায়নি প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্ণেরা।”^{২৮}

গান্ধীজি ‘হরিজন’দের বুকো টেনেছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা দিয়ে যেতে পারেননি। রামায়ণের গল্পেও আমরা পাই শূদ্র শম্বুকের হত্যার বিবরণ। যে শম্বুককে যজ্ঞ করার অপরাধে, যা ‘শাস্ত্রবিরোধী’ কাজ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, সেজন্য তাকে রামচন্দ্র হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই হত্যাকাণ্ডের ট্র্যাডিশন এখনও সমানে চলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির হয়তো বদল ঘটেছে। কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের ওপর রক্তপাতহীন হত্যালীলায় এতটুকু ছেদ পড়েনি। সতীনাথের আখ্যানে পাঠক ঢোঁড়াইদের সেই রক্তপাতহীন হত্যালীলার সাক্ষী থেকেছে।

ঔপনিবেশিক শাসনে জেগে ওঠা প্রতিবাদী চেতনায় সতীনাথের ঢোঁড়াই কিংবা তারাশঙ্করের করালীরা তার উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে পৌঁছেও বীরষা কিংবা বাঘারুদের রূপকল্পে মাটি, দেশ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আশ্বেদকর কেবল স্বরাজ লাভকেই সর্বরোগের ‘মহৌষধ’ ভাবতে রাজি ছিলেন না একেবারেই। কেবল এক হাত থেকে আর এক হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক মর্যাদা আর স্বাধীনতার সুষম বন্টনের পক্ষে ছিলেন তিনি।

পুরানো রামায়ণের রূপকল্প তাঁর পাঠের আখ্যান শরীরে ধারণ করলেন বটে সতীনাথ। কিন্তু সেই রূপকে তিনি নিজেই ভেঙে ফেলছেন। সতীনাথের সাথে তাঁর পাঠকও বুঝতে পারেন, পুরানো রামায়ণের যুগের সঙ্গে নতুন রামায়ণের যুগের আর কিছুই মিলছে না।

ঢোঁড়াইরা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অশুভ আঁতাতের কাছে হেরে যায় বটে, কিন্তু হারিয়ে যায় না। সতীনাথ সেই হারিয়ে না যাওয়ার আখ্যান লিখে চলেন:

“...বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড় থাকলে ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলত, ‘ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।’ (স্বর্ণসীতা)

উল্লেখপঞ্জি

- ১। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ইং ২০০১ (১৯৯৮) পৃঃ ১২
- ২। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *ফিরে দেখা সারাজীবন*, ১ম খন্ড, সম্পা: মুজিবল হক, কবীর ও মাহবুব কামরান; ঢাকা: ম্যাগনাম ওপাস, ২০০০, পৃঃ ১৫-২৪
- ৩। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ইং ১৯৯৯ (১৯৯৮) পৃঃ ৩৬
- ৪। ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'; 'ভাদুড়ীজী', সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, সম্পা: আফিক ফুয়াদ, কলকাতা: দিব্যরাত্রির কাব্য, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ১১৩
- ৫। ভাদুড়ী, সতীনাথ; সতীনাথ বিচিত্রা, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, বাং কার্তিক ১৩৭২ (প্রথম সংস্করণ)
- ৬। ঐ
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; *আরণ্যক*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, বাং শ্রাবণ ১৪১৪, (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩)
- ৮। ভাদুড়ী, সতীনাথ; *সতীনাথ গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পা: শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃঃ ১
- ৯। ঐ
- ১০। ঐ, পৃঃ ৭
- ১১। ঐ, পৃঃ ১২
- ১২। আমিন, শাহিদ; 'গান্ধী যখন মহাত্মা', অনুবাদ- রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, রুশতী সেন, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ইং ২০০০ (১৯৯৮), পৃঃ ৫২
- ১৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩-৬১
- ১৪। ভাদুড়ী, সতীনাথ; *সতীনাথ বিচিত্রা*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, বাং কার্তিক ১৩৭২ (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৩৫
- ১৫। ঐ, পৃঃ ৩৭

১৬। আমিন, শাহিদ; ‘গান্ধী যখন মহাত্মা’, অনুবাদ- রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, রুশতী সেন, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ইং ২০০০ (১৯৯৮), পৃঃ ৬৫

১৭। গুহ, রণজিৎ; ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ইং ২০০০ (১৯৯৮), পৃঃ ২৮

১৮। সেনমজুমদার, জহর; ‘সতীনাথ ভাদুড়ী আর আমাদের নিম্নবর্গচর্চা’, *সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা*, সম্পা: আফিক ফুয়াদ, কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানও ধারণ করে থাকে এক ঐতিহাসিক কালখন্ডকে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখনীর ধারায় তিনি এক বিকল্প ইতিহাস চেতনাকে তুলে আনেন তাঁর পাঠে। স্বপ্ন-লিখন এই অর্থে ‘খোয়াবনামা’। ইসলামি কিতাবের ‘খোয়াব’ এর ব্যাখ্যা আর ইসলামি রাজ ইতিহাস লেখনীর ঐতিহ্য কিংবা পরম্পরাকে ইলিয়াস জুড়ছেন তাঁর পাঠের সঙ্গে। ইসলামি ইতিহাস নির্মাতারা ‘নামা’-র ধারায় বিভিন্ন শাসকবর্গ, তাদের যুদ্ধজয়, সাম্রাজ্য অধিকার বা বিস্তার, শাসনপদ্ধতি, এককথায় বলতে গেলে সম্রাটদের গৌরবগাথার একধরনের লিখিত বয়ান বিবৃত করছেন। কিন্তু ইলিয়াসের আখ্যান জুড়ে থাকে কাৎলাহার বিলের কৃষিজীবী মানুষদের জীবনসংগ্রামের কাহিনী। তাদের পূর্বপুরুষদের লড়াইয়ের ঐতিহ্য, তার মূল্যবোধকে নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার যে তাগিদ, সেই তাগিদের ইতিহাস লিখে চলেন ইলিয়াস।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ ও ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসে যে ইতিহাস নির্মাণ করেন, তা ভীষণভাবেই ‘সাম্প্রদায়িক’। একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ইতিহাস। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী-ফকিরদের যৌথ বিদ্রোহকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকৃতি দেননি। ঐতিহাসিক সেই বিদ্রোহের ভগ্নাংশ অর্থাৎ কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ যা ঐতিহাসিকভাবে সঠিকও নয়, তিনি সেই ইতিহাসকে তাঁর সাহিত্যে জায়গা করে দিয়েছেন।

অপরপক্ষে, আঞ্চলিক পেশিশক্তির বিরুদ্ধে কাৎলাহার বিলের কৃষিজীবীদের লড়াইয়ে ইলিয়াস সন্ন্যাসী-ফকিরদের সম্মিলিত লড়াইয়ের ইতিহাসকে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন।

ইলিয়াসের পাঠে প্রবেশ করার আগে একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব, এই সন্ন্যাসী বা ফকির আসলে কারা, কোন কারণেই বা তারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ মোটামুটি এই সময়কালের মধ্যে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ‘সন্ন্যাসী ও ফকির’দের সম্মিলিত বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ বলে অভিহিত হয়ে আসছে। এ আসলে ঐতিহাসিকের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বিদ্রোহ পর্বে সন্ন্যাসী ও ফকিররা পরস্পরের সাথে নানা কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও (এমনকি এক সম্প্রদায়ের হাতে অন্য সম্প্রদায়ের হত্যা বিরল নয়) তাদের যুথবদ্ধ লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে কিংবা ধর্মীয় আচরণ পালন করতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন এরা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজব্যবস্থা কায়েম হওয়ার প্রথম ভাগে বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা কৃষক মননে জেগে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে “বহিরাগত

ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী ও দস্যুদের বাংলাদেশ আক্রমণ”^১ আর বিদ্রোহীদের ‘হিন্দুস্থানের যাযাবর’ বলে দেগে দিয়েছিলেন। শাসক বর্ণিত বয়ান অনুযায়ী, এঁদের ‘মোটিভ’ ছিল কেবল চুরি-ডাকাতি করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁনারা বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি শাসকের বয়ানের মতো এতই সহজ? তা নয় একেবারেই। কারণ, ইংরেজ সরকারের তৎকালীন দস্তাবেজ, ‘গেজেটিয়ার’দের নানা লেখাপত্র থেকে আমরা সরকার বর্ণিত বয়ানেরই নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করি।

স্যার উইলিয়াম হান্টার যিনি ভারতের ইংরেজ সরকারের একজন ‘গেজেটিয়ার’ ছিলেন, তিনি গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কথিত ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’কে ‘কৃষক বিদ্রোহ’ বলে বিবেচনা করেছিলেন। কেন হান্টার এমন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, তার কারণগুলি যদি একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি তবে ইংরেজ শাসকের ঔপনিবেশিক শোষণের চেহারাটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

মূলত বাংলা-বিহার অঞ্চলের কারিগর ও কৃষক জনগণ ইংরেজদের ভ্রান্ত কৃষিনীতি এবং সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক শোষণে উৎপীড়িত হয়ে আত্মরক্ষার স্বার্থেই ইংরেজ বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর এই ভূমিহীন কৃষকদের বিদ্রোহকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর কাজ হারানো, বেকার ও বুভুক্ষ সৈন্যগণের একটা অংশ। অন্যদিকে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় (যেমন মারাঠা সম্প্রদায়ভুক্ত ‘গোসাই’, শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ‘নাগা’, ‘পূর্বিয়া’, ‘বকসারিয়া’, ‘ভোজ-পুরী’, ‘মাদারী’ সম্প্রদায়ভুক্ত ফকির) যারা বিহার ও বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং জীবিকার জন্য চাষবাস করে কৃষকে পরিণত হন। ইংরেজ সরকারের শোষণনীতির শিকার হয়েছিলেন এরাও। উপরন্তু এদের ধর্মানুষ্ঠানে বা আচার-ব্যবহারের উপর ইংরেজ শাসকদের হস্তক্ষেপ এঁনারা মেনে নিতে পারেননি। কারণ ইংরেজ শাসকের পূর্বে কোনো শাসকই এদের দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণের ক্ষেত্রে কর নিলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। ফলে ইংরেজ শাসকের হাতে তাঁদের জীবিকা ও ধর্মাচরণ দুই-ই শোষণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুতরাং, ইংরেজ শাসকদের এই অর্থনৈতিক শোষণ, অত্যাচার কৃষক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল। হান্টার তাই খেয়াল করেছিলেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানহীন বেকার সৈন্য, কৃষক, সন্ন্যাসী-ফকিররাঃ

“জীবিকা নির্বাহের এই শেষ উপায়টি (বিদ্রোহ) অবলম্বন করতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারাই তথাকথিত গৃহত্যাগী (গৃহহারা) ও সর্বত্যাগী (সর্বহারা) সন্ন্যাসীরূপে দলবদ্ধ হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের সংখ্যা এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত উঠিয়াছিল।”^২ (ভাষান্তর-সুপ্রকাশ রায়)

অন্য আর এক ‘গেজেটিয়ার’ এল এম এস ও ম্যালিও বিদ্রোহীদের দেখেছেনঃ

“ ধ্বংস-প্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর সৈন্য ও সর্বস্বান্ত চাষী...মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাহাদের জীবিকা হারাইয়াছিল, তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ...জমি হইতে উচ্ছন্ন, সর্বস্বান্ত-কৃষক ও কারিগরগণ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।”^৩ (ভাষান্তর-সুপ্রকাশ রায়)

এই সম্মিলিত বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ইংরেজ রাজশক্তি যে কতটা বিব্রত এবং একইসঙ্গে এই বিদ্রোহকে রদ করার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তা বিস্তারিতভাবে বিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের মনোভাবটি আমরা খানিক বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব লেস্টার হাচিন্সন-এর বয়ানে:

“ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফলেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ ধুমায়িত হইয়া ওঠে। অত্যধিক হারে জমির উপর কর ধার্য করিবার ফলে কৃষকেরা জমি হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া জীবিকার একমাত্র উপায় হিসাবে লুণ্ঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সশস্ত্র দলে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারা সারা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং জমিদারদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। দেশের সকল বিভাগালীরাই তাহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হেস্টিংস শীঘ্রই দেশের সকলকে বুঝাইয়াছিলেন যে, শাসকগণ কিছুতেই বে-সরকারী ডাকাতি ও লুণ্ঠন বরদাস্ত করিবে না। ভারতীয় আইনের বিধি অনুসারে একমাত্র নরহত্যার অপরাধেই প্রাণদণ্ড দেওয়া চলিত। হেস্টিংস সেই ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, যাহারাই ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, তাহাদের পরিবারের সকলকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হইবে এবং তাহাদের গ্রামের উপর পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য হইবে। এই বিশেষ অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল কঠোর দমননীতি দ্বারা বিক্ষোভ দমন করা সম্ভব হইল না, বরং সেই ধুমায়িত বিক্ষোভই ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’-এর আশুনে পরিণত হইল। সন্ন্যাসীরা কৃষকদের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের সহিত ধর্মের প্রেরণা যুক্ত করিল, তাহাদের বহু সশস্ত্র দল কোম্পানি-শাসকদের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা কোম্পানির সৈন্যদের ছোট ছোট দলের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া বড় বাহিনী আসিবার পূর্বেই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। হেস্টিংসকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।”^৪

লেস্টার ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দেন এই ভাবে, “...এই বিদ্রোহের (সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) একশত বৎসর পরে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখা দেয়, এই ‘সন্ন্যাসী’ বিদ্রোহ তাহারই অগ্রদূত।”(এ)

অথচ অল্প কিছু মানুষের গবেষণা প্রয়াস ছাড়া এই ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের ধারকরা যোগ্য সম্মান তো দেয়ইনি, বরং ঔপনিবেশিক মানসিকতায় জর্জরিত সেই চৈতন্য উত্তর উপনিবেশ কালেও সমান উদাসীনতার সাথে ‘সন্ন্যাসী-ফকির’-দের যৌথ বিদ্রোহকে দেখেছে।

ইলিয়াস তাঁর পাঠে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সেই মূল্যবোধকে কেন্দ্রীভূত করে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাৎলাহার বিলের কৃষিজীবী মানুষরা কীভাবে সেই লড়াইয়ের পরম্পরাকে, মূল্যবোধকে নিজেদের যাপনে আত্মস্থ করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, তারই আখ্যান লিখে চলেন। ইলিয়াসের আখ্যানের চরিত্ররা একটি বিশেষ সময়পর্বের মধ্যে (ভারত বিভাগের খানিক পূর্ববর্তী সময় থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের সামান্য পরবর্তী সময় পর্যন্ত) ঘোরাফেরা করলেও তিনি তাঁর বাচনিক কৌশলে ইতিহাসের বিস্তারকে এক ধাক্কায় বেশ অনেকখানি বাড়িয়ে নেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগের যে সেতুটি সে দিকে গভীর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি ফেলেন ইলিয়াস।

ঠিক যেমনভাবে ইলিয়াস তাঁর ‘চিলেকোঠার সেপাই’তে পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে জুড়েছিলেন এক বিস্তৃত ইতিহাসচেতনার সাথে, যেখানে:

“...মহল্লার জ্যান্ত মানুষদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে ১০০ বছর আগে সায়েবদের হাতে নিহত, সাহেবদের পোষা কুকুর নবাবদের হাতে মিরাতের সেপাই, বেরিলির সেপাই, লক্ষ্মী-এর মানুষ, ঘোড়াঘাটের মানুষ, লালবাগের মানুষ। ...”^৫

তেমনিভাবেই ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানে বর্তমান প্রজন্মের লড়াইকে জুড়ছেন সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহ্যের সঙ্গে।

“...অনেকদিন আগে, তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপেরও জন্ম হয়নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ না-কি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয়নি, হলেও বন কেটে বসত-করা বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, এসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেশুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্যে করতোয়ার দিকে ছোট্টার সময় মুনসি বরকতুল্লা শাহ বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে।”^৬

‘খোয়াবনামা’র আখ্যানে বারবার ঘুরে ফিরে আসে, পুনরাবৃত্ত হয় এই ইতিহাস। কেন এমন পুনরাবৃত্তি ঘটে আখ্যানে, কোন গূঢ় তাৎপর্য ছড়িয়ে দিতে চান ইলিয়াস তাঁর পাঠের আখ্যান শরীরে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ইলিয়াসের এই তথ্যটুকু নিয়ে পাঠককে পাড়ি জমাতে হয় ইতিহাসের অন্দরমহলে।

প্রায় অর্ধ-শতকাল অবধি ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী-ফকিররা যে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এঁনারা মূলত ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেরিলা আক্রমণ শানাতেন।

১৭৬৩ খ্রিঃ-১৮০০ খ্রিঃ-এর মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী ও ফকির নেতার উত্থান ঘটেছিল। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্বর ব্রিটিশ রাজশক্তি বিপর্যস্ত হয়েছে, পর্যুদস্ত হয়েছে অসংখ্যবার।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সুযোগ্য নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম হলেন মজনু শাহ। ‘মহাস্থানগড়’-কে কেন্দ্র করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। অসম যুদ্ধে তাঁর বাহিনীকে বারংবার পরাজয় স্বীকার করতে হলেও নতুন উদ্যম নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী,^{১৯} ১৭৭১-এ মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন প্রায় আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে লে.টেলর ও লে. ফেল্টহাম পরিচালিত বিশাল ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মজনু শাহ পরাজিত হয়ে মহাস্থানগড় দুর্গে

আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালেই বিদ্রোহীরা উত্তরবঙ্গে জড়ো হন আবার। একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতবর্ষের আপামর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষকে এক ছাতার তলায় আনতে তৎপর হয়েছিলেন। মানবতাবিরোধী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাতে দেশীয় জমিদার কিংবা ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীর যোগদান করে সে প্রচেষ্টাও তিনি করেছিলেন। প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছিল, তা ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত আঞ্চলিক কর্মচারীদের সরকারকে পাঠানো রিপোর্ট^{২০}

থেকে উঠে আসে। ইংরেজ শাসকরা ভীত হয়ে এইসব বিদ্রোহীদের গায়ে জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী, অত্যাচারী তকমা সঁটে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা বিশেষ সফল হয়নি। কারণ, তাহলে ব্রিটিশ সরকারের আঞ্চলিক গুণ্ডচররা কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহী দলে যোগ দেওয়ার কথা জানাত না। কিংবা তারা যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল সরকারকে, সেইসব রিপোর্টে^{২১} বিদ্রোহী জনগণ দ্বারা ধনী, লুণ্ঠনকারী জমিদারদের কাছারী লুণ্ঠ করার খবরই কেবলমাত্র থাকত না। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর দেশীয় সৈন্যরাও যে সহযোগিতা করছিল না সরকারকে, তা স্পষ্ট হয় গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের কার্যপ্রণালীতে। তিনি বহু দেশীয় সৈন্যকে ইংরেজ বাহিনী থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন এবং দেশীয় সৈন্যদের বেসামরিক পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীরা রংপুর জেলায় তাদের আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। ব্রিটিশ রাজস্ব আদায়কে যেমন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা, তেমনিভাবে তাদের সামরিক শাসনকেও ফলে কড়া হাতে বিদ্রোহ দমন করতে শুরু করে তারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। ফলে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কড়া দমননীতি প্রয়োগ করে ১৭৭৩-এ হেস্টিংস বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হয়েছে,^{২২} এমন বয়ান দিলেও ঐতিহাসিক বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলে। বিদ্রোহীদের পুরোপুরি নির্মূল করে ফেলা যে সম্ভব হয়নি তার প্রমাণ ১৭৭৬-এর শেষভাগে বিদ্রোহীদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হওয়া। মজনু শাহ উত্তরবঙ্গ থেকে দিনাজপুরে এসে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের আবার সংঘবদ্ধ করেন। ইংরেজরা তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে তিনি বগুড়া থেকে করতোয়া নদী ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পার করে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ঘাঁটি গাড়েন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সন্ন্যাসী-ফকিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

নিরসনের চেষ্টা করেছিলেন মজনু ভীষণভাবেই। তাই উত্তরবঙ্গ বাদে অন্যান্য স্থানে যেখানে সন্ন্যাসী ও ফকিররা আলাদা আলাদাভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইলেন, সেখানে তাদেরকে একজোট করেন। সরকারি চিঠিপত্র^{১১} চালাচালি থেকে জানা যায়, এর পর মজনু শাহের উপস্থিতি দেখা যায় কখনও ময়মনসিংহ জেলায়, কখনও বা মালদহে। ব্রিটিশ রাজশক্তির চোখে ধুলো দিয়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম তিনি জারি রেখেছিলেন। কিন্তু ১৭৮৬-তে ব্রিটিশ আক্রমণে ‘সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ’ এর এই নায়ক শহীদ হন।

মজনু শাহের মৃত্যু পরবর্তীতে মুশা শাহ ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যান। ভবানী পাঠক ছিলেন ‘সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ’র একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীনেতৃত্ব। তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার শাসনব্যবস্থা একপ্রকার অচল করে তুলেছিলেন। রংপুর থেকে পাঠানো এক রিপোর্ট^{১২} অনুসারে, লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ভবানী পাঠকের সৈন্যরা পরাজিত হয় “এই যুদ্ধে স্বয়ং ভবানী পাঠক ও তাঁহার প্রধান সহকারী বলে কথিত একজন পাঠান ও অপর দুইজন সহকারী নিহত হন।” (ঐ)

ইলিয়াস এই ঘটনাকেও তাঁর আখ্যানের অঙ্গীভূত করে নেন। স্বপ্ন ও বাস্তবের অদ্ভুত এক দোলাচলের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকে ‘খোয়াবনামা’র আখ্যান। কাংলাহার বিলের মানুষদের লৌকিক বিশ্বাস, মিথ, কিংবদন্তি গড়ে তোলে ইলিয়াসের পাঠের আখ্যান শরীর। কাংলাহার বিলের কৃষিজীবী মানুষরা এই বিশ্বাস লালন করে চলে যে, “মুনসি বরকতুল্লা শাহ গোরা সেপাইদের সরদার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিল ঘোড়া থেকে। বন্দুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্মমাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসলো কাংলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিল জুড়ে, আর রাতভর বিল শাসন করে ঐ পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। ...” (পৃ ৯)

আর ইলিয়াস তাঁর পাঠের মধ্যেও চারিয়ে দেন বিকল্প ইতিহাস চেতনার ধারাভাষ্যটি, “...জাগরণে তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, স্বপ্নের আড়ালেই কি সে রয়ে যাবে সারাটা কাল?” (পৃ ১২)

জীবন ও জীবিকার সংঘাত কাংলাহার বিলের বাসিন্দাদের কোন্ বোধে উন্নীত করে, কিংবা তাঁদের কোন্ সীমাবদ্ধতাকে পরিস্ফুট করে তোলে, সেই ঘটনাবলীর আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে পাঠক ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটতে দেখেন। আঞ্চলিক শাসনশক্তি জোতদারদের শোষণে ক্রমাগত পৃষ্ঠ হতে থাকে তমিজ, হরমতুল্লা, গফুর কলুর মতো বর্গাচাষিরা।

উচ্চবর্গের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাতন্ত্র নিম্নবর্গকে তার স্বাধীকার থেকে দূরে রাখার যেসব পন্থা অবলম্বন করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল নিম্নবর্গের কিছু মানুষকে কেন্দ্রীয় সুবিধার অংশভাগী করে নিয়ে তাদের স্বজাতি থেকে, সমাজ কিংবা সেই সমাজের মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। সুতরাং অন্তর্ভুক্তি আর বহিষ্কারের এই রাজনীতিটি শাসকবর্গ জারি রাখে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে লিখছেন: “যদি কালে দুই একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনার মন্ডলীতে তুলিয়া নেন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না...”^{১০}

ইলিয়াসের আখ্যানে জোতদার শরাফত মন্ডল কিংবা কালাম মাঝিকেও দেখা যায়, জাতের মানুষদেরকেই তারা প্রভূত পন্থায় অত্যাচারের নাগপাশে আবদ্ধ করে।

অন্যদিকে তমিজ, কেরামত আলি, বৈকুণ্ঠ সহ কাৎলাহার বিলের কৃষিজীবী মানুষরা ‘সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ’এর দীর্ঘ লড়াইয়ের ঐতিহ্য, যে লড়াই ছিল মাটির জন্য, নিজেদের জীবিকার উপর নেমে আসা আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই পরস্পরকে মননে-চিন্তনে বহন করে চলেন এরা।

তাই মুনসির ‘বিল শাসন’ বিষয়ে যে কিংবদন্তি তা যেন বা সেই মূল্যবোধ সম্পর্কে কাৎলাহার বিলের বাসিন্দাদের সজাগ করে রাখার ‘ঐতিহাসিক প্রয়াস’। সেইসঙ্গে শাসকের শোষণ বিষয়েও।

জীবিকার সঙ্গে কাৎলাহার বিলের মানুষদের অনবরত যে সংঘর্ষ, তার সূত্রটি আখ্যানের শুরুতেই ধরিয়ে দেন ইলিয়াসঃ

“...বিলের পশ্চিমে বিলের তীর থেকে এদিকে খালপাড় পর্যন্ত জায়গাটা এখন পর্যন্ত খালেই পড়ে রয়েছে। তারপরই মাঝিপাড়া। মাঝিপাড়ার মানুষ অবশ্য নিজেদের গ্রামকে ওভাবে ডাকে না, গোটা গ্রাম জুড়ে তো আগে তাদেরই বসবাস ছিল। এখন পাঁচ আনা ছয় আনা বাসিন্দাই চাষা। আগে কয়েক ঘর কলু ছিলো, আট মাইল পশ্চিমে টাউনে তবির মুজারের ‘রহমান অয়েল মিল’ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে কলুদের অর্ধেকের বেশি চলে গোলা পুবে যমুনার ধারে। যে কয় ঘর আছে তাদের কারো কারো ঝাঁক জমিতে আবাদ করার দিকেই বেশি। ...শরাফত মন্ডলের হাতে (বিলের) খাজনা দিয়ে দূরদূরান্তের জেলেরা এসে মাছ ধরে।” (পৃঃ ৯-১০)

সুতরাং, জীবিকার প্রয়োজনে যেমন এই অঞ্চলের মানুষদের স্থানান্তর ঘটে। তেমনি উপায়ান্তর না দেখে জীবিকা বদলাতে বাধ্য হন এদের অনেকেই। ‘মাঝির বেটা’ তমিজকে তাই রুজি-রোজগারের আশায় বেরিয়ে পড়তে হয় খিয়ার এলাকায় ধান কাটতে কিংবা ‘কামারের বেটা’ যুধিষ্ঠিরকে জোতদার শরাফত মন্ডলের জমিতে চাষ করতে হয়। অর্থাৎ, ‘জল-জঙ্গল-জমি’তে শরাফত মন্ডলের মতো বিভ্রাটের অধিকারই কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তমিজ,

যুধিষ্ঠিরদের মতো কাংলাহার বিলের আপামর শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে না।

তাই তমিজের পূর্বপুরুষ ‘বাঘাড় মাঝির বাপ বুধা মাঝির দাদা না পরদাদা না-কি তারও দাদা সোভান ধুমা’ যার আমলে ‘...(বিলের) অর্ধেক, অর্ধেক না হলেও সিকি জমির জঙ্গল কেটে বসত’ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ভূমিকম্পের ফলে যমুনার জল বাড়লে গিরিবড়াঙা, কামারপাড়া, নিজগিরিবড়াঙা ডুবে গেলে চাষির বংশ মাঝির বংশে পরিণত হয়। আর তমিজের বাপের আমলে স্থানীয় জমিদারকে টাকা দিয়ে বিস্তীর্ণ বিলের পত্তন নেয় শরাফত মন্ডল। ফলত বিল আর বিলের জেগে ওঠা জমির মালিকানা ধীরে ধীরে তারই হস্তগত হয়। জল আর জমি দুইই হারানো বংশের এক উত্তরাধিকার তাই স্বপ্ন দেখে শরাফত মন্ডলের জমিতে বর্গা করে:

“...আমন বেচে যা টাকা পাবে সবটা পেটের ভিতরে না সৈঁধিয়ে জমিয়ে রাখবে। এক জোড়া গোরু, লাঙল, মই কিনতে পারলে জমি বর্গা পেতে কষ্ট হয় না। বেশি নয়, বছর তিনেক বর্গা করতে পারলে দুটো ফসল ঘরে তুলে অন্তত ১৫ শতাংশ জমি কেনার টাকা হয়। নিজেদের ভিটার লাগোয়া জমিটা মন্ডলের কাছ থেকে ফেরত পাওয়া যায় কি-না একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী।” (পৃঃ ৬৫)

শরাফত মন্ডলের জমিতে বর্গা করার অনুমতি পায় বটে তমিজ। তবে কঠোর পরিশ্রম করে ২ বিঘা ৭ শতাংশ জমিতে ১৮ মণ ১২ সের ধান ফলিয়ে সকলকে অবাক করে দিলেও তার ভাগে জোটে মাত্র পাঁচ সের! শরাফত মন্ডলের বড়ো ছেলে আবদুল আজিজের প্ররোচনায় মোষের দীঘির জল যা তমিজ একলাই নালা কেটে নিয়ে এসেছিল, সেই জল বাবদ তমিজকে তার সামান্য প্রাপ্য ধান থেকেও একটা অংশ দিতে হয়।

তাই খিয়ারে খেতমজুরের কাজ করতে গিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা:

“জমি হলো জোতদারের, ফসল কে কী পাবে সেটা তো থাকবে মালিকের এজিয়ারে। অথচ ফসলের বেশীরভাগ দখল করতে আধিয়াররা নেমে পড়ে হাতিয়ার হাতে। ...ফসল হলো জমির মালিকের জান...” (পৃঃ ৪৩)

এর থেকে বর্তমান অভিজ্ঞতায় নতুন এক বোধে উন্নীত হয় তমিজ:

“ আধিয়ারদের তাড়া খেয়ে (খিয়ারে) কাটা ধান ফেলে সে দৌড় দিলো। দৌড়, দৌড়, দৌড়। তার গায়ে তীর বিঁধলো একটার পর একটা...। তা তীরের খোঁচায় টিকতে না পেরে তমিজ একটা জমির আলে দাঁড়িয়েছিলো বাবলা গাছের নিচে। তা ঐ রোগা বাবলা গাছ তাকে আর আড়াল দেবে কোথেকে? উপায় না দেখে তমিজ তখন কাঁটাওয়ালা বাবলাগাছ ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ে মারতে লাগলো ঐ চাষাদের দিকে। কিন্তু কোন শালা কি মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বাবলা ডাল একটার পর একটা গিয়ে লাগে জোতদারদের গায়ে। শরাফত মন্ডলের গলার ঠিক নিচে বাবলাকাঁটা লেগে রক্ত বেরুচ্ছে। বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে আবদুল আজিজ আবদুল কাদের দুই ভাই। অন্তত আবদুল

আজিজের মুখ বরাবর কাঁটাওয়ালা মোটা একটা বাবলা ডাল লাগাবার জন্যে তমিজ নানাভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু জুত করতে পারে না। তমিজ আরও ডাল ভাঙতে লাগলো। জোতদার শালা ঝাড়েবংশে হারামজাদা, শালার একোটা মাক্কুচোষা। তমিজের এত কষ্ট, এত মেহনত, এত কষ্টের মেহনতের ফসল সব নিয়ে তুলতে হবে শালাদের মোটা গোলায়া” (পৃঃ ৬৬)

সুতরাং, একদিকে শোষিতের প্রতিবাদ, আর একদিকে শোষিতের প্রতিবাদী আকাজক্ষা উভয়কেই একই সমতলে এনে দাঁড় করায়। এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে ‘তেভাগা আন্দোলন’এর ঐতিহাসিক পটভূমিটি জুড়ে যেতে থাকে ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানো।

কখনও তমিজের বর্ণণায়, কখনও কেরামত আলির গানে পশ্চিমে খিয়ার অঞ্চলে জোতদারদের দ্বারা আধিয়ারদের শ্রম লুণ্ঠন, আর তারই প্রতিবাদে কৃষকদের সংগঠিত গণজাগরণের চিত্রটি নতুন মাত্রা লাভ করে। কেরামত আলি কাংলাহার বিলের বাসিন্দাদের কাছে তেভাগা নিয়ে বাঁধা গান শোনাতে চায়। কিন্তু আলিম মাষ্টারের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দেয় এ অঞ্চলের শোষিতের প্রতিবাদহীনতার চিত্রটি:

“ ইগলান গান এদিকে এখনো মানুষ লিবি না। এটিকার মানুষ এখনো জোতদারের পিছে লাগে নাই।” (পৃঃ ১৫২)

তা সত্ত্বেও কেরামত আলি শোনায় তার গানঃ

“চাষার মেহনতের দাম খালি আকাম জোতদারেরই কাছে দুই মাস গেলে চাষা ঘোরে মহাজনের পাছে। জোতদার মহাজনে জো ও তদার মহাজনে মনে মনে উহাদের পিরীত। চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুইজনেরই রীত। চাষার বড়ো দুষমন চা যা র বড়ো দুষমন এই দুইজন যেমন পাখির দুষমন খাঁচা। চোরের দুষমন চান্দের পহর পোকের দুষমন প্যাঁচা। রাবণের দুষমন রা ব ণে র দুষমন ভাই বিভীষণ রামের অনুচর। ধর্মে করে কিল বরণ অধর্মের পর। দেহের দুষমন আ র দেহের দুষমন ভেদবমন গাছের দুষমন লতা। চাষার দুষমন জমিদার জোতদার অতি লেয্য কথা। বলি জমিদারি ব অ লি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই। জোতদার পাবে একভাগ ফসল চাষায় দুইভাগ পাই। তাই তেভাগার তা ই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষাড় জয়। চাষা বিনা জগৎ মিছা সবোজনে কয়। দেখো বর্মনী মায়ে আহা বর্মনী মায়ে পুলিশের ঘায়ে হইয়াছে জখম। পায়ে গুলি খাইয়াও বুকের বল তো নাই কম। সকল চাষীজনে স অ ক ল চাষীজনে নাই মানে জোতদারের জুলুম। চাষীর রক্তে জোতদার বাঁচে সকলের মালুমা” (পৃঃ ১৫৮)

জোতদারদের বিরুদ্ধে কোনো এক অঞ্চলে ঘটা এই প্রতিবাদ, শ্রোতাদের মনে প্রতিবাদী স্পৃহার জন্ম দেয় কিনা জানা না গেলেও তাদের মনোযোগী করে তোলে। কথকের বয়ানে:

“গানের শ্রোতার সংখ্যা বাড়ে খুব দ্রুত। মোটরগাড়ির পেছনে ছোট লোকদের কেউ কেউ রাস্তা থেকেই চলে গিয়েছে নিজের নিজের বাড়ি, তবে বেশিরভাগই ফিরে এসেছে গানের সঙ্গে সঙ্গে, এবং কেরামতের মাথা ঝাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে তো বটেই, শ্রোতার মাথা দোলায়।” (পৃঃ ১৫৮)

এরই সমান্তরালে চলতে থাকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পুষ্ট ‘পাকিস্তান কায়েমের’ আন্দোলন। পাকিস্তান কায়েমের চেতনা কাৎলাহার বিলের বাসিন্দাদের জীবনপ্রবাহে কী প্রভাব ফেলে কিংবা আদৌ কী কোনো রদবদল ঘটে, সেটি বুঝে নেওয়ার আগে পাকিস্তানপন্থী আন্দোলনের ভিত্তিভূমিটিকে একবার বুঝে নিতে চাইব। ‘জাতীয়তাবাদ’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আমরা খানিক ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। ইলিয়াসের আখ্যানের সময়কালের প্রেক্ষিতে সেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিটিকে আরও একটু বিস্তারিতভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সব দিক থেকেই ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই আত্মপরিচয় সন্ধানের স্বরূপটি নিয়ে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌক্তিক ও মানসিক দ্বন্দ্ব দুইই প্রকট হয়ে ওঠে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা মূলতঃ পাশ্চাত্যের ‘রেনেসাঁ’র দান, একথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে। তাই বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়েও পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখনীর কাঠামোটিকে গ্রহণ করলেন যখন, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবে সেখানে ব্রিটিশ রাজ ইতিহাস রচয়িতাদের মতোই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। ‘বাঙালির ইতিহাস’ বলে যে ইতিহাস চালানোর চেষ্টা করা হল, তা আদতে ‘হিন্দু বাঙালীর ইতিহাস’, সে দিক থেকে দেখতে গেলে বাঙালির খন্ডিত এক অংশের ইতিহাস। ফলত সামাজিক-অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবেও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ‘অপর’ করে দেওয়ার এই প্রবণতা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে তাদের আত্মপরিচয়ের যে সংকট তৈরি হয়, তা থেকে তারা আত্মপরিচয়ের সন্ধানে রত হন।

ঊনবিংশ শতকে জাতি হিসাবে বাঙালির (হিন্দু বাঙালি) যে ইতিহাস নির্মিত হয়, সেখানে ব্রাত্য মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান ঊনবিংশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুরু হলেও বিংশ শতকের শুরু থেকেই তা সর্বাধিক গতি পায়। যে প্রশ্নটি মূলত বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মানুসন্ধান সংকট তৈরি করেছিল, তা হল তারা কি বাঙালি, না মুসলমান অথবা বাঙালি মুসলমান; কিংবা বাঙালি মুসলমান যদি হন তবে আগে মুসলমান পরে বাঙালি না পরে মুসলমান আগে বাঙালি। অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের কোন সংকট তৈরি হয়নি, যা হয়েছিল বাংলায় বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের শাসনব্যবস্থাকে আরও সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে সেই অসন্তোষে প্রভূত ইন্ধন জোগাল। তাই লোকজ সংস্কৃতির যে ধারাটি, যেখানে ভিন্নতা

সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভবপর হয়েছিল তাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সেই ধারাটিকে সমূলে উৎখাত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল। কি দেশীয় কি বিদেশী উভয় ক্ষমতালিপ্সুর তত্ত্বাবধানে।

“রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই মুসলিম স্বাভাবিকবোধকে উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আইন ও তা রোধ করার আন্দোলন, বাঙালি মুসলমানের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও তজ্জনিত ক্ষোভ, সুবিধাজনক স্থানে অমুসলমান নেতৃবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, মিঃ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার প্রভৃতি বিষয় ওই বাধার প্রাচীরকে দৃঢ় করে তোলে। আর অবশ্যই উপনিবেশবাদী বিদেশি ইংরেজ শাসকবর্গ তাদের কূটবুদ্ধিজাত ‘ভাগ কর এবং শাসন কর’ নীতি অনুসরণ করে এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন জোগায়।”^{১৪}

কেবল ১৯০৫-এই নয় ১৮৯১, ১৯০১, ১৯০৩-এও বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টা করে ইংরেজ শাসকশক্তি। আসলে উপনিবেশিক শিক্ষার সংস্পর্শেই হিন্দু বাঙালীর মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল, তার ফলে তাদের যে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশ পেতে থাকে, তাতে করে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে, সেজন্যই ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতির মাধ্যমে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা করার কৌশল তারা নিয়েছিল।

“বঙ্গভঙ্গ করে, পূর্ব বাংলার সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে এবং পশ্চিমবাংলার সঙ্গে বিহারকে জুড়ে দিয়ে, এবং উভয় খন্ডে বাঙালি হিন্দুকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করে প্রভুশক্তি বাঙালিকেই খর্ব করতে চেয়েছিল...এটা স্পষ্টতই ছিল একটা রাজনৈতিক চাল এবং স্যার সলিমুল্লাহর মতো পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজপতির একটু আশ্বস্তবোধ করেছিলেন যে, এতদিনে প্রভুশক্তি মুসলিম আনুগত্যকেও স্বীকার করে নিয়ে তার মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়েছে। ...তবে এই রাজনৈতিক চালটা ধরা পড়ে যায়, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পথে বাঙালি হিন্দুর স্বাভাবিকবোধ বরং আরও শক্তি সঞ্চয় করে। চতুর ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ রহিত করে একদিকে বাঙালি উত্তেজনাকে প্রশমিত করে, আবার একই চালে; কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতি সরিয়ে নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি নেতৃত্বকে পঙ্গু করে দেয়। ...

বঙ্গভঙ্গের সুবাদে বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ফাঁকটা সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটা বেরিয়ে পড়ল। প্রায় একশ বৎসর ধরে যে বাঙালির কথা আমরা শুনে এসেছি, সেটা বৃহত্তর বাঙালি জাতির উপরের স্তর। শ্রেণীগতভাবে এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুস্তর, সম্প্রদায়গতভাবে। নিম্নবর্ণের হিন্দুকে নিয়ে এই বাঙালির তেমন দুশ্চিন্তা ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল মুসলমানকে নিয়ে। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবাদটি অজানা ছিল না, রেনেসাঁসের বাঙালির কাছে।”^{১৫}

ফলশ্রুতিতে ঢাকার নবাব (ইংরেজ অনুগৃহীত) সলিমুল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে ১৯০৬-এ ঢাকায় তৈরি করলেন ‘সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ’। ইংরেজ শাসকশক্তি, সেই সুবর্ণসুযোগ, যার জন্য তারা অপেক্ষায় ছিলেন সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ১৯০৯-এ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা যে, তারা তাদের আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নিতে পারেননি। স্বদেশী আন্দোলনের নামে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের যে পন্থা গৃহীত হয়েছিল, তাতে যেমন হিন্দু অনুষ্ণ মিশে গিয়েছিল, তেমনি শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়া শুধু মুসলিম সম্প্রদায় কেন, ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার সাযুজ্য খুঁজে পাননি। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত সুবিধাবাদী সন্দীপ চরিত্রের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে।

এক গবেষকের ভাষ্যেঃ

“হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী অনাস্থা, মুসলমানদের নিদারুণ সংকটময় অস্তিত্ব এবং ধর্মান্ধতার অভিপ্রকাশে মুসলমানদের জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথটাই বিশেষ করে উন্মুক্ত হয়। ধর্মের আবেদনে ভোট পাবার পথটাও সুগম হয়। লখনৌ চুক্তি, বেঙ্গল প্যাক্ট বা খিলাফৎ আন্দোলনের সামরিক সন্ধি ছাড়া কোন পর্বেই উভয় সম্প্রদায় একযোগে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নেয়নি।”^{১৬}

তুলনামূলকভাবে বিচার করলে সংখ্যার বিচারে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম কৃষকদের সংখ্যা ছিল বেশি। গ্রামবাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘মুসলিম লীগ’ এর প্রভাব থাকায় তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার করে, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে, তাদেরকে কেবল ব্যবহারই করেছে। এই সুবিধাবাদী রাজনীতি তার শ্রেণিচরিত্র নিয়ে উঠে এসেছে ইলিয়াসের আখ্যানো।

প্রথম থেকেই অবাঙালি মুসলমান পরিচালিত মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে তেমন ভাবিত ছিল না। ফজলুল হকের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া ‘কৃষক-প্রজা পার্টি’, পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ‘পাকিস্তান কায়ম’এর আন্দোলনে ১৯৩৭-এ কৃষক-প্রজা পার্টির বেশিরভাগ সদস্যই মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ‘ছ’আনা খাজনাদারী’ কৃষকরা ভোটের অধিকারী হওয়ায় কৃষক আন্দোলনের নাম করে মুসলমানদের থেকে ভোট পাওয়ার পথ সুগম হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৩৭ এর নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মোঃ আকরম খাঁ। লীগের সম্পাদক শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর আব্দুল হাশিম ছিলেন সহকারী সম্পাদক। লীগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ সুরক্ষায় তৎপর বিভিন্ন উপদল সক্রিয় ছিল।

এতদসত্ত্বেও আত্মপরিচয় তৈরি করার যে সুযোগ বাঙালি মুসলমান পোষণ করছিল, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র তৈরি হলে তার সফল রূপায়ণ ঘটবে এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বস্তরের বাঙালি মুসলমান ‘পাকিস্তান কায়েমের’ আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। মহঃ আলি জিন্নাহ-র মতো নেতৃত্বের তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট ‘পাকিস্তান’ নামধারী স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। কমিউনিস্টরাও বিশেষতঃ তেভাগা আন্দোলনের বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা পাকিস্তানপন্থী আন্দোলনে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে গতির সঞ্চর করেছিল।

রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশের আগেই পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে একটি অপরতার ভাব পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট ‘সহি মুসলমান’দের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যে সব দাবী নিয়ে ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্র গঠিত হল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হল না। সার্বিক মুসলিম সমাজের আত্ম অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার পূর্বের মতোই আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিল নতুন ভঙ্গিতে, পুরোনো রূপে।

মূল সমস্যাগুলিকে পিছনে রেখে সদ্য গঠিত সরকার পাকিস্তানকে কী করে ইসলামি আদর্শে আদর্শায়িত দেশ হিসাবে গড়ে তোলা যায়, সেই প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। যার প্রথম আক্রমণটি এসে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান জনগণের ব্যবহৃত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা-ভাষী হলেও, এছাড়া অন্যান্য প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষাভাষীর মানুষ থাকলেও উর্দুকে জোর করে ‘রাষ্ট্রভাষা’ হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয় স্বাধীনতার পরপরই।

সুতরাং, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদের সূচনারমুহূর্ত এ থেকেই শুরু হয়। বিদেশ থেকে আমদানি দ্রব্যমূল্য এমনকি দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের ক্রমশঃ দামবৃদ্ধি, অন্যদিকে বিদেশে রপ্তানি করা কাঁচামালের মূল্যহ্রাসের ফলে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়, তা ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯, আবার ৫২ থেকে প্রকট আকার ধারণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের ‘এলিট’ শাসকবর্গ পাকিস্তান আন্দোলনে সহযোগীদের সাথেও বিমাতৃসুলভ আচরণ করেন। দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সরিয়ে সামন্তস্বার্থের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো হয়, পরবর্তীতে নুরুল আমীন। এভাবেই পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মতামতকে উপেক্ষা করে মুসলিম লীগ এলিট শ্রেণি স্বার্থে কাজ করে যেতে থাকে। ফলে একদিকে মুসলিম লীগের পূর্ব-পাকিস্তানের কর্মীদের মধ্যে যেমন হতাশা দেখা দেয়, তেমনি পাকিস্তানপন্থী আন্দোলনে সমর্থন জানানো কমিউনিস্টরাও স্বাধীনতা পরবর্তীতে বুর্জোয়া এই সরকারের উৎখাত করতে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। এরই পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তানের উপেক্ষিত মুসলিম লীগের কর্মীদের নিয়ে গঠিত

হয় ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’, যার নেতৃত্বে থাকেন আবুল হাশেম।
আওয়ামী মুসলিম লীগ ইসলামি ভাবাদর্শে চলার কথা বললে এর পাশাপাশি:

“মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, পূর্ববাংলার জন্য নিজস্ব পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, মূল শিল্প ও বিদেশি শিল্প জাতীয়করণ, পর্যায়ক্রমে সমস্ত কৃষিজমিকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা, শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত ও একচেটিয়া মালিকানা রোধ, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে সক্রিয় নিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার নীতি।”^{১৭}

কমিউনিস্টরা সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিলে তাদের উপর পাকিস্তান সরকারের কড়া দমননীতি নেমে আসে। পূর্ব-পাকিস্তানে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হলে স্তালিনের অনুমোদনক্রমে ‘প্রথম পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার’ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আর এই কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে কমিউনিস্টদের মুসলমান অংশ ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ কেও তার সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ‘আওয়ামী লীগ’ এ পরিবর্তিত হতে হয়।

ফজলুল হকের ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ পাকিস্তানপন্থী আন্দোলনে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কৃষক-শ্রমিক তথা আপামর শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল, এবং স্বাধীনতা লাভের পর তা পূরণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সে দাবি তো পূরণ হয়ইনি। উপরন্তু চাষীদের অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি দেখা দেয়। ফলে এই ক্ষোভ, অসন্তোষ ও হতাশা থেকে পুনরায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে ‘কৃষক-প্রজা পার্টি’ ‘শ্রমিক পার্টি’ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তানের শাসকবর্গ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আড়ালে যে অগণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে রেখেছিলেন, তার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে একটি বিকল্প শাসনপদ্ধতি তুলে ধরা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য যেমন ছিল, তেমনি ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই বৈষম্য আরও প্রকট করে তোলা হল। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের উপরে উর্দু ভাষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া বাঙালি মুসলমানরা ভালোভাবে নেননি। কৃষক শ্রমিক পার্টি এই ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলে।

১৯৪৬ এর স্বাধীনতার পূর্বের পরিষদের সদস্যরাই পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পরেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নানা অজুহাতে পাকিস্তান সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। আসলে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার যে ভাটা পড়েছিল, সে আশঙ্কা তারা করেছিলেন। আর সে আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম লীগের লজ্জাজনক হারা। আওয়ামী লীগ অগণতান্ত্রিক মুসলিম লীগ

সরকারকে উৎখাত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করার প্রয়াস শুরু করে। আর ৫২'র ভাষা আন্দোলন সেই প্রয়াসে আরও গতি সঞ্চার করে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ৭১'এ পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এই পর্বটি আমরা আলোচনায় আনব না।

ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'র পাঠের প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পূর্বে 'পাকিস্তান কায়েম'এর আন্দোলন, 'দ্বি জাতি তত্ত্ব' এর ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র হলে সাধারণ মুসলমান জনগণের সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে, এমন আকাঙ্ক্ষা তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী নেতারা করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিটি আদতে কী-এর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদ বিরোধী আর একটি ধারা যা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তার স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় বলে সেই বিকল্প ইতিহাস চেতনাকে অন্ধকারে রেখে দিতে চায়, সে সীমান্তের এপার হোক বা ওপার।

ঔপনিবেশিক শাসন শক্তির পাশাপাশি আঞ্চলিক শাসন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম যৌথ লড়াইয়ের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসচেতনাকে কাংলাহার বিলের শ্রমজীবী মানুষরা কী করে তার উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলেন, সেই বিকল্প ইতিহাসচেতনাকে যেমন ইলিয়াস হাজির করেন তাঁর আখ্যানে, সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চেতনার সঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাসবোধের যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের বিন্যাস রচিত হয় আখ্যানে, তার রূপটি পাঠকের কাছে ইতিহাস সমেত উঠে আসে।

যেমনভাবে আর্ঘ ও অনার্য জাতি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও দুই সংস্কৃতির বিমিশ্রণ ঘটেছিল। তেমনিভাবেই হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। ধর্মগত মৌলবাদ গ্রামবাংলায় বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষের কাছে এসে তার শক্তি হারিয়েছিল। ধর্মের আড়ম্বর অপেক্ষা জীবিকার নিশ্চয়তা শ্রমজীবী মানুষের কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। তথাকথিত বিপ্রতীপ বলে আখ্যায়িত দুই ধর্ম বাংলায় যে তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠেছিল বেশ অনেকখানি, ইলিয়াসের আখ্যান সেই সংস্কৃতিরই এক ধারাত্মক রচনা করে। তমিজের বয়ানে:

“ বাজানের ভাতের খালিত তুমি পাও দেও? ইটা কেমন কথা গো? মুখের অন্ন তুমি পাও দিয়ে ঠেলো? নক্ষীর কপালেত তুমি নাখো মারো? কেমন মেয়ামানুষ গো তুমি?...” (পৃঃ ১৮)

“...জমি হলো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর বেটাবেটি হল তার ফসল। সেই ফসল নিয়ে টানাটানি করলে জমির গায়ে লাগেনা।” (পৃঃ ৪৩)

একইসঙ্গে শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে ধর্মীয় আচরণের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' রূপটিকেও তুলে ধরেন ইলিয়াস বৈকুণ্ঠ গিরি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে:

“মুশকিল কি, চেরাগ আলির ঘরে বৈকুষ্ঠ জল খেতে পারেনা। তার জাত তো আলাদা, পিপাসা পেলেও জাত বাঁচাতে তাকে তেষ্ঠা মেটাতে হয় আম খেয়ে। এদের ঘরে বৈকুষ্ঠ বসতে পারে, মুড়ি খেতে পারে, গুড় দিয়ে তো পারেই, এমন-কি, নুনতেল দিয়ে মাখালেও দোষ নাই। কিন্তু পারে না কেবল জল স্পর্শ করতে। জাতের দোষ হয়ে যাবো।”(পৃঃ ৬০)

ধর্মীয় আচরণগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও বৈকুষ্ঠের যে উপলব্ধি আর ফকির চেরাগ আলির সেই উপলব্ধিতে সহমত প্রকাশ, তা আসলে ভিন্নতার মধ্যেও ঐক্যের যে সূত্র গাঁথা পড়েছিল, বিশেষত: গ্রামবাংলার শ্রমনির্ভর সমাজে, তার সেই অসাম্প্রদায়িক রূপটিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আখ্যানে কুলসুম আর বৈকুষ্ঠের সেই কথোপকথনটি:

“কুলসুম আর একবার মুখ ঝামটা দিলে বৈকুষ্ঠ বলে, ‘ভগবান জাত সৃষ্টি করিছে, আমরা সিটা লষ্ট করবার পারি?’

‘তোমার ভগবান মানুষের ঘরত আম খাবার হুকুম দিছে না? ভগবানের লালচ বেশি, পানি খাবা দিবি না, আমেত আপত্তি নাই,’...

‘উগলান কথা কওয়া হয় না, কওয়া হয় না। তোর আল্লা যা, হামার ভগবানও তাই। ফারাক খালি নামের। লয় গো ফকিরের বেটা?’” (পৃঃ ৬০)

ধর্মের আচরণসর্বস্বতা যে দারিদ্রতায় জরাজীর্ণ, ভুখা মানুষগুলোর কাছে আলাদা করে কোনো আবেদন নিয়ে আসে না, তা জোতদার শরাফত মন্ডলের নাতি হুমায়ূনের চল্লিশায় (শ্রাদ্ধ) মূর্ত হয়ে ওঠে কথকের বর্ণণায়:

“ খানকা ঘরের উঁচু বারান্দায় সতরঞ্চির ওপর দুই দিকে বালিশ দিয়ে সাজানো জায়নামাজে বসে নাজাতের দোয়া পড়ে টাউনের জামে মসজিদের ইমান আলহাজ মওলানা হাফেজ আবু নসর বরকতুল্লাহ প্রতাপপুরী সাহেব। দুই পাশে বালিশের শিওরে কাঁসার গ্লাসে চালের ভেতর গোঁজা আগরবাতির ধোঁয়ায় ভর করে মওলানা সাহেবের সুরেলা মিষ্টি গলার এহলান ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির সামনে বিশাল জমায়েতে এবং দেখতে দেখতে তা মিশে যায় বড়ো বড়ো ডেকচির গোরুর গোশতের সুরুরার গরম ধোঁয়ায় এবং রূপান্তরিত হয় খিদে-বাড়ানো-সৌরভে।

.....মওলানার মোনাজাত হচ্ছিলো উর্দুতে, উর্দুতে সমবেত জনতার অজ্ঞতা এই ভাষার প্রতি তাদের ভক্তিকে উষ্ণ দেয় এবং এর রহস্যময়তা আরবি আয়াতের সঙ্গে সবরকম ফারাক মোচন করে। ওদিকে পণ্ডজিতে বসা লোকজনের অনেকেই অধৈর্য হয়ে নুন দিয়েই ভাত মেখে খেতে শুরু করেছে। এমন-কি, কারো কারো ‘ক্যা গো তরকারি দিবা না?’ ‘ভাত কি শুধাই খাওয়া লাগিব?’ ‘তোমরা কিসের সাকিদারি করো? পাততে গোশতো কুটি’ প্রভৃতি অভিযোগ ঠোকাঠুকি লাগে মোনাজাতের কথার সঙ্গে। এতে বিরক্ত হয়ে কাদের আজিজের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম ছাড়ে, ‘খামোশ’! এই শব্দটির অর্থ পরিবেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদেরও জানা না থাকায় ঘাবড়ে গিয়ে

গোশতের বালতি মাটিতে রেখে তারা মোনাজাতের জন্যে হাত তোলে এবং তাদের দেখাদেখি হাত তোলে খেতে বসা মানুষের অনেকে। নুন দিয়ে ভাত যারা মেখে ফেলেছিল তাদের নাকে লাগে ভাতের গন্ধ এবং প্রাণে অর্ধভোজনং-এর তৃষ্ণার বদলে তাদের পেটে তারা পায় খিদের নতুন মোচড়া ...” (পৃঃ ৯২-৯৩)

আর এই বয়ানের সঙ্গেই ইলিয়াস বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) উপর পাকিস্তান গঠনের পূর্বে ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরেও অবাঙালি মুসলমান শাসকদের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক যে আধিপত্যকামী মানসিকতা তাকেও যুক্ত করে দেন। যা দেশকালের সীমা পেরিয়ে এক চিরন্তন আধিপত্যকামী মানসিকতার সাথেও পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেন। ভারতবর্ষীয় পাঠক কি ইলিয়াসের এই আয়নায় জাতীয় ভাষা হিসাবে সংবিধানে কোন ভাষার স্বীকৃতি না থাকলেও বিভিন্ন ভাষা-বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা, সংস্কৃতিকে জোর করে জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সেই কূটনৈতিক কৌশলটি খেয়াল করেন না একেবারেই?

সাধারণ মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভেদের যে বেড়া জাল তা উপক্রে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হন। ক্ষমতা লিপ্সু স্বার্থাশ্বেষীর দল ধর্মের দোহাই দিয়ে সেই বেড়া জালকে আরও শক্ত-পোক্ত বাঁধুনিতে ধর্মীয় বিভেদকে প্রকট করে তুলতে চায়। শরাফত মন্ডলের নাতি হুমায়ূনের চল্লিশায় হিন্দু অধ্যুষিত কামারপাড়ার আধিয়ারদের খাওয়ানোর ব্যাপারে কথা বলতে গেলে জমিদারের নায়েব হিন্দুধর্মের ‘শিখন্ডী’ হিসাবে হাজির করে নিজেকে:

“...আমার ধর্ম আমি মানি। তোমার ধর্ম ভুল হোক আর যাই হোক, সেটাই ঠিক মতো পালন করো। মানুষের সবই অনিত্য, এই ভবসংসারে সবই নশ্বর, কিন্তু জাত আর ধর্ম হলো জীবনের সার, ওটা গেলে মানুষের আর রইলো কী?” (পৃঃ ৯২)

নায়েবের এ বক্তব্য ধর্মীয় অনুশাসনকেই মূর্ত করে তোলে। সেইসঙ্গে বক্তব্যের সুবিধাবাদী সারগ্রাহীতাকেও হাজির করে। শরাফত মন্ডলও ভিন্ন জাতের মাখাদের চটাতে চায় না। কারণ ধর্ম আলাদা হলেও উভয়ের মধ্যেই যে গোপন শোষণতান্ত্রিক বোঝাপড়া রয়েছে, ক্ষমতাতন্ত্রের অভিন্ন প্রতিনিধি যে তারা!

তাই যে আধিয়ারদের অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে তাদের জীবনধারণকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দেয় শরাফত মন্ডল, ধর্মীয় ভাবনাতে তাদের অবস্থার প্রতি কাতরতা আখ্যানে কথকের শ্লেষকে আরও তীব্র করে তোলে:

“বিকাল শেষ হতে না হতে বেশ ঠান্ডা পড়লো। খানকাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শরাফত মন্ডল দেখে শুকনা খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে তার বাড়ির কামলাপাট, সঙ্গে আরো কিছু মানুষ জুটেছে। লোকগুলো জেয়াফত খেয়ে এখনও বাড়ি ফিরে যায়নি। এরা এতক্ষণ করে কী! আহা থাক, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, এখানে একটু গা গরম করে থাক। শরাফত ছলছল চোখে তাদের দেখে তার ছোট্টো দাদাভাইকে আল্লা বেহশত নসিব করবে, মাসুম

বাচ্চাটার জন্যে এই লোকগুলোর দোয়া আল্লার আরসে পৌঁছবে সবার আগে। গরিব মানুষকে আলাদা করে দোয়া পড়তে হয় না, ভুখা মানুষের তৃপ্তিই আল্লাকে সন্তুষ্ট করে, গরিব বান্দার ভরা পেটের চেয়ে সুখ আল্লার কাছে আর কী আছে। এই এলাকায় এতগুলো গরীব মানুষ ভুখা নাঙা মানুষ আছে বলেই তো তাদের খাইয়ে তৃপ্তি দেওয়ার সুযোগ আজ শরাফত মন্ডলের হলো। ...” (পৃঃ ১০৭)

পাঠে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির যে স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু আখ্যানে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে। শরাফত মন্ডলের পুত্র কাদেরকে মুসলিম লিগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে দেখি উক্ত পাঠে, যে কিনা ‘পাকিস্তান কায়েম’-এর আন্দোলনের একজন সহযোদ্ধা। কাদেরের সিদ্ধান্ত আর চিন্তা তাই:

“ ‘পাকিস্তান ছাড়া মোসলমানের টেকার পথ নাই, মোসলমান কী ছিলো আর কোথায় নেমেছে’...” (পৃঃ ৮৫)

ছোটোমিয়া, ডাক্তার আমিরুদ্দিন আর কাদেরের সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গিতে কথক উপরিউক্ত ধারণাটি স্পষ্ট করে দেনঃ

“...’তাহলে খালি হিন্দুদের দোষ দেন কেন! মোসলমান ডাক্তার যদি ভালো হয় তো হিন্দু পেশেন্ট কি তার কাছে না গিয়ে পারবে! টাউনের চোখের ডাক্তার দুজনেই তো মোসলমান, হিন্দুরা তাদের দিয়ে চোখ দেখায় না! কলকাতার সবচেয়ে বড়ো দাঁতের ডাক্তার তো মোসলমান, তার পেশেন্টদের মধ্যে হিন্দুর হার কত বেশি তা হিসাব করে দেখেছেন’?

... ‘এসব একসেপশান। টোটাল পজিশনটা কী’?

... ‘বিজনেস ওদের হাতে, চাকরি বাকরিতে বড়ো বড়ো পোস্টও দখল করে আছে তো ওরাই। ভালো পজিশনে থাকলে জাতভাইদের টেনে তোলা যায়। আমাদের সেই অপরচুনিটি কোথায়’?

... ‘গভর্নমেন্ট তো মুসলিম লীগের। লীগ তো বেঙ্গল রুল করছে অনেক দিন। এক ফেমিন ছাড়া এদের বড়ো কীর্তি আর কী বলেন তো’?

...মোসলমান জমিদার যারা আছে, তারা এখন কী হেল্প করছে? হিন্দু জমিদার ছাড়া দেশে স্কুল কলেজ হতো? এই ডিস্ট্রিক্টে এক জেলা স্কুল ছাড়া আর সবই হিন্দু জমিদারদের দান। টাউনে তো বড়ো বড়ো জমিদার দুজনেই মোসলমান, কোনো স্কুল কলেজের জন্যে একটা ইট দিয়েছে কেউ? ডাক্তার সাহেব, এসব কাজ করতে আলাদা মেন্টালিটি লাগে,...”

... ‘মেন্টালিটি তৈরি হবে পাকিস্তান হলে। নিজের দেশে পাওয়ার থাকবে নিজেদের হাতে, মুসলমান জমিদারদের তখন সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি গ্রো করবো।’ (পৃঃ ৯৬)

আর ইতিহাসসম্পৃক্ত এই ‘মেন্টালিটি’র ধারাবিবরণী লিখে যেতে থাকেন ইলিয়াস। কী করে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমকে, তাদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ‘পাকিস্তান হাঁসেল’ হয়, সেই ইতিহাস মূর্ততা লাভ করে আখ্যানে।

যেমনভাবে শ্রমজীবী মানুষকে কাছে টানতে তেভাগা আন্দোলনকে ব্যবহার করেছিল মুসলিম লিগ, আখ্যানে চেরাগ আলির শিষ্য কেলামত আলি, গান বাঁধতে যার জুড়ি মেলা ভার, সেই কেলামত আলির ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জমিদার-বিরোধী তেভাগার গানকে মুসলিম লিগের নেতা ইসমাইল হোসেন ‘হাইজ্যাক’ করে তার বক্তব্য পেশ করে:

“... ‘হাজেরানে মজলিশ, ভাইসব, জমিদারদের হাত থেকে, মহাজনদের হাত থেকে, জোতদারদের হাত থেকে মুসলমান প্রজাদের বাঁচাবার জন্যই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের নেতা কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আজ পাকিস্তান হাঁসেলের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কবি কেলামত আলি তার গানের মধ্যে দিয়ে মুসলিম লিগের কথাই বলে গেলো। রাতের ঘুম আর দিনের আরাম হারাম করে আমরা’...” (পৃঃ ১৫৯)

অন্যদিকে শরাফত মন্ডলের পত্তনি নেওয়া বিলে মাছ ধরার ‘অপরাধে’ তমিজের বাপকে শরাফত মন্ডলের হাতে নিগৃহীত হতে হলে, সেই নিগ্রহকে কেন্দ্র করে কাৎলাহার বিলের শ্রমজীবী মানুষরা এই অন্যায়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকে। আদতে জোতদার শরাফত মন্ডলের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই মানুষগুলির দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ তমিজের বাপের নিগ্রহকে কেন্দ্র করে বহিঃপ্রকাশের স্পষ্ট অভিমুখ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও কাৎলাহার বিলের মানুষের জেগে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে কালাম মাঝি ইন্ধন জোগায়, নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে। সে মাঝিদের ক্ষোভকে সেটুকুই কাজে লাগাতে চায়, যাতে করে তার ‘সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে’। তাই মাঝিরা যখন এই সিদ্ধান্তে আসে যে:

“... ‘চলো শালা মন্ডলের বাড়িত চলো। পাটের গোছের মাথতে আগুন লিয়া চলো। শালার বাড়িত আজ আগুন দেওয়া হোক। মন্ডলের বেটা শালা বাড়িত দালান তোলার হাউস করিছে গো, কাল গোরুর গাড়িত কর্‌য়া ইট লিয়া আসিচ্ছিলো দেখলাম। শালার দালান তোলার হাউস (ইচ্ছা) হামরা মিটিয়া দেই চলো।’ (পৃঃ ১৮৫)

এরকম দৃঢ় সংকল্পে কালাম মাঝি ভয় পেয়ে যায়। কারণ তাতে করে তো তার স্বার্থ সুরক্ষিত হবে না। তাই মাঝিদের এই গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে কালাম মাঝি যখন ঘোষণা করে,

“পত্তন লেওয়ার হক আছে কার? মাঝিগোরে বিল পত্তন লিবি মাঝি। ...”

তখনই ‘জাতের নামে বজ্জাতি’র চেহারাটি ফুটে ওঠে। ঘটনার অগ্রগতিতে যখন সেই বিলের পত্তন শরাফত মন্ডলের হাত থেকে কালাম মাঝির হাতে আসে, তখন ক্ষমতালোলুপ সেই রূপটি বেরিয়ে পড়ে:

“...কালাম মিয়া সরকারের কাছ থাকা ল্যাখাপড়া কর্‌য়া ট্যাকা দিয়া বিল ইজারা লিছে। উগলান কাগজপত্র দেখা তাক খাজনা দিয়া হামরা আজ আসিছি বিলের মাছ ধরবার। আজকার দিন এই বিলের মাছ ধরমু হামরা যমুনার মাঝিরা।” (পৃঃ ২৭৭)

...আগে শরাফত মিয়ার খাজনা দিয়া হামরা বছর বছর মাছ ধরিছি, কেউ ক্যাচাল করে নাই। ...” (পৃঃ ২৭৯)

তমিজের বাপ যার নিগ্রহকে কেন্দ্র করে কালাম মাঝির এত দায়ভার ছিল, শরাফত মন্ডলের হাত থেকে বিল তার হাতে এলে, তমিজের মাছ ধরার জেদের প্রতিক্রিয়ায়:

“...’এই কুত্তার বাচ্চা। তোর বাপ মন্ডলের কোবান (জুতো) খায়া ঠিক হছিলো। এখন কোবান দেওয়া লাগে তোক” (পৃঃ ২৭৯) আর তারপরই কথকের আপাত সরল বয়ানের তীব্র শ্লেষঃ “ মনে হচ্ছে, তমিজের বাপের দোয়া পাবার পর তার প্রতি ভক্তি রাখার দরকার কালাম মাঝির ফুরিয়ে গেছে।” (পৃঃ ২৭৯)

আর এই মাছধরাকে কেন্দ্র করেই অসাবধানতাবশতঃ তমিজের হাতে কালাম মাঝির বিলে খাজনা দিয়ে মাছ ধরতে আসা আলি মামুদের দলের একজন গুরুতর আহত হলে তমিজকে ফেরার হতে হয়।

সুতরাং, কাৎলাহার বিলের দখল মাঝিদের নিজেদের ‘জাতের লোকের’ কাছে যায় বটে, কিন্তু সেই বিলের উপর মাঝিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেবল তা ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েই রয়ে যায়। এক ক্ষমতালোভী থেকে আর এক ক্ষমতালোভীর কাছে।

ঔপনিবেশিক শোষণ শক্তির বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী-ফকিরদের মিলিত যে সংগ্রাম, যাকে উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে নিয়ে চলেন কাৎলাহার বিলের বাসিন্দারা, সেই ইতিহাসচেতনার উপরেও আঘাত নেমে আসে ধর্মীয় ভাবানুভূতির রূপ নিয়ে। ইতিহাস আর লৌকিক বিশ্বাস এই দুইয়ের মিশেলে কেরামত আলির সঙ্গে কথোপকথন বৈকুণ্ঠ গিরি বিবৃত করে শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের সম্মিলিত প্রতিরোধের সেই দূরতম অতীতকে:

“... সে (বৈকুণ্ঠ) হলো গিরিবংশের মানুষ, তার রক্তে দশনামার একনামা গিরির রক্ত টগবগ করে ফুটছে। এই যে দেখা গিরিবড়াঙা ...পোড়াদহের মেলার হাট, এসব তো ছিলো তাদেরই রাজত্ব। ভবানী পাঠকের মানুষ তারা, তার ছকুমে যুদ্ধ করেছে কোম্পানির গোরাদের সঙ্গে। কোম্পানির কামানো গোলায় ভবানী পাঠক দেহ রাখলো মানাস নদীর জলে, তার দলের লোকজন সব ছিটকে পড়লো এদিক ওদিক। আর বৈকুণ্ঠের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, না-কি তার বাপ, বাপ না -কি তারও ঠাকুর্দা, সেই সন্ন্যাসী...জঙ্গল সাফ করে...জমি করলো, আখুন্দিয়া, মীর্জাপুরে তাদের বিঘা

বিঘা জমি। বৈকুণ্ঠের ঠাকুরদার সৎভাইদের চক্রান্তে তার বাপ গরিব হয়ে গেলো; বাপ মরলে বৈকুণ্ঠ হলো ঘরছাড়া। সে এখন তেলি সাহাদের গদিতে সামান্য চাকরি করে খায়। তারা হলো সন্ন্যাসী, তাদের ক্ষত্রিয় ধর্ম, জাতে সন্ন্যাসী।

.....এই যে পোড়াদহের মেলা, এই মেলা প্রথম চালু করে ভবানী পাঠক, ...বামুন কায়েতকেও ঠাকুর দর্শন দেবেন না, দেবতা হলে কী হয়, বামুন কায়েতকেও ওই যুদ্ধের সময় দাসখত লিখে দিয়েছিলো গোরাদের পায়ে।” (পৃঃ ১৪৯)

কেরামতের স্বগতঃ ভাবনায়:

“...যমুনার পশ্চিমধারে সে বরং দেখেছে মজনু শাহের দাপটা। যমুনার পেটে যাওয়ায় মাদারিপাড়ার মানুষজনের ভাবসাব দেখে মনে হতো, ওরা সবাই মজনু শাহের একেকটা পালোয়ান। শালারা খেতে পায় না, পাছায় কাপড় নাই, এক ছটাক জমি নাই, এদিকে গলার তেজ ষোলো আনা। ...চেরাগ আলি তো ওই পালোয়ানদের গুপ্তির মানুষ। কেরামত তো তার মুখেই শুনেছে, করতোয়ার পুবে পশ্চিমে ‘সবই ছিলো মজনুর দাপটে, গোরারা জবর দখল করিছে।’ (পৃঃ ১৪৯)

বৈকুণ্ঠের বয়ানে:

“ ... ‘মুনসি আছিলো ভবানী পাঠকের সেনাপতি। গান শোনো নাই, ‘ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে, এই সেনাপতিটা কও তো কেটা’?

.....পাকুড়গাছের মুনসি হলো ওই সেনাপতি। মজনু শাহের লিজের মানুষ আছিলো তাই।

.....‘কিন্তু ফকির কতবার কছে, গানের মধ্যেও কছে, মুনসি আছিলো মজনু শাহের খাস মানুষ’।

...‘কথা ঠিক। ভবানী পাঠকের কাছে মজনু বার্তা পাঠালো। কী? না, তোমার আছে কালি। তোমার তাকত আলির হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে।—ঠিক কি-না? হামরা একত্তর হই। আলি আর কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া হয়। থাকবার পারে?—তা হলে বোঝো। তখন দুইজনের মানুষ আর আলাদা থাকলো না। মুনসি তখন ভবানী সন্ন্যাসীর হুকুম মানি না কিসক’?...” (পৃঃ ১৪৯)

এই যে সম্প্রীতির ইতিহাস, সংহতির ইতিহাস, একে প্রথাগত ধর্মাচরণ ভুলিয়ে দিতে চায়। তাই নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বৈকুণ্ঠসহ উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন ধর্মীয় বিশ্বাসের এক ধারাভাষ্য, যার সঙ্গে ইতিহাসের ন্যূনতম সম্পর্কটুকুও নেই:

“ দক্ষযজ্ঞের সময় মা দুর্গা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের দেহ রাখলে মহাদেব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। আপন পরিবারের দেহ নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন। তো নারায়ণ দেখলেন, মায়ের দেহে পচন ধরলে ধরিত্রীর বায়ু বিষাক্ত হয়ে যাবে। তিনি তাঁর চক্র দিয়ে মায়ের পবিত্র দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়। নানা স্থানে পড়লো দেহের নানা অংশ। আর মায়ের বাম কর্ণ পড়লেন কোথায়? –না ওই করতোয়ার তীরে...” (পৃঃ ২০৭)

তাই মানাসের দ’য়ে মা ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় নায়েব। কিন্তু ধর্মে হিন্দু হলেও এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনা দশরথ, যুধিষ্ঠির কিংবা পালপাড়ার কেউ পালরা। কারণ এ ইতিহাস সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নন, যতটা বিশ্বস্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের বীরত্ব সম্পর্কে:

“...এই এলাকার ব্যামাক মানুষ জানে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, পাল, নমঃ শূদ্র, মোসলমান সবাই জানে, এই দ’য়েই কোম্পানির সেপাইয়ের গুলিতে দেহরক্ষা করেন ভবানী পাঠক। সঙ্গে ছিলো তার পাঠান সেনাপতি। তো সেটা কী আর আজকের কথা? বৈকুণ্ঠের ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তারও বাবা, না-কি তার ঠাকুরদা, সে তো সন্ন্যাসীর সঙ্গেই ছিলো।”

ধর্মকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের প্রতিনিধিরা কীভাবে ব্যবহার করে তার একটি সুস্পষ্ট রূপাবয়ব উঠে আসে ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানে।

শরাফত মন্ডলও বিশেষ আপত্তি জানায় না নায়েবের মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। উপরন্তু খুশিই হয়। নায়েব আর শরাফত মণ্ডলের মনোগত যে গোপন সুবিধাবাদী আঁতাত তা আখ্যানে প্রকাশ্যে আসে:

“...বৈকুণ্ঠ আর কর্মকারদের ডেকে আনা হয়েছে মণ্ডলের পরামর্শেই। তবে মরা মানাসের দ’থেকেই সন্ন্যাসীর উৎখাতের বুদ্ধিটি নায়েববাবুর নিজের।

...পোড়াদহ মেলায় মুসলমানেরা যেসব কীর্তি করে মন্ডল সেসব সহ্যই করতে পারে না। ওখানে মা দুর্গাকে বরং প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে মাঝিপাড়ার মানুষদের ওখান থেকে হটানো যায়।

...নায়েববাবুর স্বপ্ন টাউনের ভদ্রলোকেরা তখন কেবল মেলা দেখতে আসবে না, পূজার উৎসবেও হৈ চৈ করতে পারবে। ...” (পৃঃ ২০৯)

সুতরাং প্রথাগত ধর্মচারীদের চোখে কাৎলাহার বিলের বাপ-ঠাকুরদা, কি তারও ঠাকুরদার আমলের বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ‘ভূতের পূজা’ রূপে গণ্য হয়। পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসী ভবানী ঠাকুরের স্থান দখল, অন্যদিকে মন্ডলদের ইটের ভাঁটা তৈরি করতে মুনসির পাকুড়গাছ কাটা পড়া- এই দুইয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রচনা করে দেয়। কাৎলাহার বিলের শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বাস, যৌথ সংগ্রামের ঐতিহ্যের মূল উৎপাতনের মধ্য দিয়ে

সেই বিদ্রোহী চেতনার মূলকে আঘাত করতে চায় নায়েব কিংবা শরাফত মন্ডলের মতো ক্ষমতাতন্ত্রের অংশভাগীরা। বিদ্রোহী চেতনার সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চায় ধর্মবিশ্বাসের মোড়কে।

অন্যদিকে ‘পাকিস্তান কায়ম’-এর রাজনৈতিক কারবারীদের চিত্রটিও আখ্যানে বেশ জোরালো ভাবে নিয়ে আসেন ইলিয়াস। ৪৬’এর বাংলা, বিহার, নোয়াখালির সেই দাঙ্গা, যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ‘কলঙ্কিত অধ্যায়’ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিও ইলিয়াসের আখ্যানে জায়গা করে নেয়।

‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়’-এই প্রবাদের সারবত্তা আখ্যানে বিশেষিত হয়ে ওঠে। দাঙ্গার আশুণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে ছাড়খার করে দেয়, মানুষ কীভাবে সেই আশুণে তার সমস্ত মানবিকতার আহুতি দেয়, এই আখ্যানে তার এক চালচিত্র উঠে আসে। যেখানে কলকাতায় আবদুল আজিজের সম্বন্ধীর হিন্দুদের হাতে নৃশংসভাবে আহত হওয়ার খবরের আঁচ এসে পড়ে গিরিবডাঙা, নিজগিরিবডাঙা, গোলাবাড়িহাটের মতো অঞ্চলগুলিতে। যেখানে মুসলিম লিগের কর্মীদের দ্বারা কামারপাড়ায় যুধিষ্ঠিরের ঘরে আশুণ লাগানোর দরুন তার বাবা পুড়ে মারা যায়। আর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষ মদত ও প্ররোচনায় কামারপাড়ার মানুষদের হাতে নিহত হতে হয় আফসার মাঝিকে। সুতরাং খুন, পাল্টা খুনের এই রাজনীতি চলতে থাকে। ৪৬-এর দাঙ্গায় যে ভয়াবহ ধর্মীয় সন্ত্রাসের চেহারা দেখেছিল ভারতবর্ষ। মদতদাতারা আড়ালেই থাকেন, আর তাদের নির্লজ্জ রাজনীতির শিকার হন সাধারণ মানুষ। বস্তুত ‘খোয়াবনামা’র আখ্যান জুড়ে এসব ঘটনাবলীর সঙ্গেই কখনভঙ্গীতে বা বয়ানে তীব্র সমালোচনা রেখে দেন ইলিয়াস।

কালাম মাঝি কাংলাহার বিলের পত্তন পেলে সেই বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে তমিজকে জেলে যেতে হলে মাঝিপাড়ার সেই অসন্তোষ, অন্যদিকে কামারপাড়ার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত যুধিষ্ঠিরের বাবাকে কেন্দ্র করে ভোটে যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে মুসলিম লিগের ‘ক্যান্ডিডেট’ ইসমাইল হোসেন ভীষণভাবেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। তাই মাঝিপাড়ার মাঝিদের ক্ষোভ কমাতে মাঝিদের বাড়িতে যেমন দাওয়াত নেন ইসমাইল হোসেন, তেমনি কামারপাড়ায় সাম্প্রদায়িক হিংসা থামাতে কলকাতা থেকে সুরেনবাবুকে নিয়ে আসেন। নিঃসন্দেহে আপাতভাবে ইসমাইল হোসেনের এই তৎপরতা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এর পিছনের ভোটের রাজনীতিটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না পাঠকের। কাদেরের সঙ্গে কথোপকথনের সেই রূপটি ধরা পড়ে:

“...এখনো তোমরা হানাফি আর মোহাম্মদি নিয়ে বাহাস করো। এসব ভুলে যাও কাদের, ভুলে যাও। ভোটের সময়টা অন্তত এসব কথা মুখেও এনো না। আজ আমি ঐ হানাফি মাঝিদের মসজিদে নামাজ পড়বো। মুসলমানের আবার এসব কী? কায়দে আজম তো সুন্নি মুসলমানও নন। শিয়াদের মধ্যেও তারা আলাদা খোজা কমিউনিটির লোক। জেলা স্কুলের হেডমাস্টার তবরাক আলি সাহেব আমাদের কী সার্ভিসটাই না দিচ্ছেন। তিনি তো কাদিয়ানি, তাকে কি আমরা বাদ দেবো?” (পৃঃ ২০০)

কিন্তু পাকিস্তান হলেও সে আশার কথা শুনিয়া ক্ষমতা দখল করেছিল মুসলিম লিগ অর্থাৎ:

“...চাষী আর জেলে আর মজুরের হক আদায় হবে পাকিস্তানে।” (পৃঃ ১৯৮)

কিংবা, “পাকিস্তানে মুসলিমদের চাকরির কোনো অসুবিধাই হবে না।” (ঐ)

সেসব আশা তো কেবল হতাশায় পরিণত হয়েছিল তা নয়, বিশ্বাসের ভিত্তিকেই সমূলে আঘাত করেছিল। তাই “...জমিদারি তো উঠেই যাচ্ছে, তখন জমিদারদের এইসব খাস জমি পাবে তো তারাই। তখন জমিতে নামো, লাঙল বাও আর ফসল তোলো। ফুলজানকে জমিতে অতটা না খাটলেও চলবে। চাষবাস নিয়ে সে যদি তমিজকে একটা মুখঝামটা দেয় তো তাতেই ফসল যা হবে তাই খাবে কে? এক দাগে ছয় বিঘা জমির মালিক হতে তার তিন বছরও লাগবে না।” (পৃঃ ২৪৮)

-এ আশা তমিজের পূরণ হয় না। উপরন্তু তার জেল থেকে মুক্তির জন্য কালাম মাঝির কূট প্রচেষ্টায় শেষ সম্বল বাড়িটুকুও চলে যায় কালাম মাঝির জিম্মায়।

আখ্যানের একটি বিশেষ জায়গা খেয়াল করবেন হয়তো পাঠক। যেখানে আজাদি উপলক্ষ্যে তমিজের সাজা খাটার মেয়াদ শেষ করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেখানে ‘আজাদি’-র আনন্দে মত্ত জনগণের মধ্যে হঠাৎ করেই ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার অংশটি:

“ কী গো? আঠারো বিশ বছরের একটা ছেলে, লুঙি আর গেঞ্জি পরা, আটকা পড়েছে উঁচু লাইট পোস্টে। লোকটা আঁ আঁ করে চিৎকার করছে আর তার হাতের মুঠিতে ধরা পাকিস্তানের নিশান, নিশানটা সবচেয়ে উঁচুতে টাঙাবে বলে সে উঠে পড়েছে বিজলি বাতির পোলে। নিচে থেকে সবাই চেষ্টায়, ‘আরে পিছনের দোতলায় লাফায়া পড়ো’, ‘নিচে লাফ দাও’। সবার পরামর্শ ও অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ছেলেটা পড়ে যায় রাস্তায়। ... নিশানটা সে ছাড়েনি, তার গায়ের রঙে নিশানের সবুজ ও সাদা জায়গার অনেকটা ফুটে ওঠে লাল টকটকে রঙে।” (পৃঃ ২৫১)

- আজাদির এই উচ্ছ্বাসময় আতিশয্যকে এমন একটি হতাশাব্যঞ্জক মৃত্যু আসলে স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যানকেই দ্যোতিত করে তোলে।

যে আখ্যানে তমিজ পায় না তার জমির অধিকার, জীবিকার অধিকার। যে আখ্যানে বৈকুণ্ঠ গিরিদের রাতের অন্ধকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়ে লাশে পরিণত হতে হয় কিংবা তেভাগার বিদ্রোহী গান বাঁধার মানুষ, যে কিনা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে জোতদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার গানে আক্রমণ শানায়, মানুষকে সচেতন করে তোলে, তাকে বাধ্য হতে হয় ‘স্বাধীন পাকিস্তান’ অর্জনের বাহবাপূর্ণ গুণকীর্তন করে গান লিখতে, যা কিনা কেরামত আলির স্বভাববিরুদ্ধ। তাই ইসমাইল হোসেনের দক্ষিণ্যে নয়, খিয়ারে গিয়ে খেটে পয়সা

উপার্জনের স্বপ্ন দেখে সে। কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে খুন হয়ে যেতে হয়। যেভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানে ‘আজাদি’র মিথ্যে স্বপ্নের মোহভঙ্গে কমিউনিস্টরা নেমে পড়েছিল আন্দোলনে, আর পাকিস্তান সরকার সেই আন্দোলনকে ‘ভারতের চক্রান্ত’ বলে নির্বিচারে কমিউনিস্ট আর তাদের লড়াইয়ে সঙ্গত দেওয়া শ্রমজীবী মানুষদের হত্যা করেছিল। খিয়ার এলাকায় যাওয়ার পথে তমিজের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যায়নে শ্রমজীবী মানুষের সেই প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে:

“ হিলির গ্রামে গ্রামে পুলিশ। থাকা চলবে না। এই গাড়ি ঠাকুরগাঁইয়ে না গেলে হয় নাটোরে যাবে। নাটোরে নেমে সুবিধা করতে না পারলে সে উঠবে নবাবগঞ্জের গাড়িতে। নাচোল যাবে। ওখানে তেভাগা কায়ম হয় তো বর্গা সে একটা ঠিকই জোগাড় করে নেবে। ফসলের হিস্যা যা জুটবে তাতে প্রথমেই খালাস করে নেবে ভিটা আর ঘর।”(পৃঃ ৩২৫)

কিন্তু ‘আজাদ পাকিস্তান’-এ সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় তমিজের মতো শ্রমজীবী মানুষদের। গিরিবড়া, নিজগিরিবড়া, কিংবা কাংলাহার বিলের রূপকের আড়ালে ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’র যে রাজনীতি, যা আসলে শ্রমজীবী মানুষদের সামগ্রিক মানোন্নয়নের ব্যাপারে স্বাধীনতা পূর্বকালের মতোই যে উদাসীনতা, সেই ইতিহাস পরিবেশিত হয়।

তাই স্বপ্ন জাগরণে মুনসির খোয়াব দেখা তমিজের বাপ তার বিবি কুলসুমের দাদা চেরাগ আলি ফকিরের ‘জরাজীর্ণ বইটা’ “...আগলে রাখে যক্ষের ধনের মতো। জাহেল মানুষ, মাঝির বেটা, বইয়ের সে বোঝেটা কী। অথচ কুলসুম এটায় হাত দিয়েছে টের পেলেই সে কটমট করে তাকায়। পাতায় পাতায় চৌকো চৌকো দাগ দেওয়া আর হাবিজাবি কী লেখায় ভরা এই বই, তার যে কী বুঝতো আল্লাই জানে, এ নিয়ে কুলসুমের মাথা ব্যথা নেই। তবে হাজার হলেও দাদার জিনিস...” (পৃঃ ১৭)

এ আসলে একটা উত্তরাধিকারকে বহন করে নিয়ে চলা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মানুষকে তার দেশ থেকে ছিঁড়ে ফেলার বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য ‘জিহাদ’।

মুনসির দেখা পেতে কাংলাহার বিলের চোরাবালিতে ডুবে মারা যাওয়ার পরও তার বিবি কুলসুমের পরাচেতনায় আসে সে। আর তার ‘বেটার বউ’ ফুলজানের স্বগতোক্তিতে:

“...মানুষে কয়, পাকুড়তলার চোরাবালির ভেতর তমিজের বাপ নাকি মাঝে মাঝে গা মোচড়ায়। ওই মানুষটাই এসব কারসাজি করছে না তো?...নিজের বংশের একমাত্র নাতনিকে দেখার আশায়, ভাতের সুবাসে তার জিভটা ঠান্ডা করার জন্যে তমিজের বাপই হয়তো ঝাঁক ঝাঁক জোনাই পোকাকার বুকে ফুঁ দিয়ে হেঁসেল জ্বালিয়ে দিয়েছে। ...কী জানি, তাকে বেপর্দা দেখে শ্বশুর যদি ঘুমঘুম গলায় একটা শোলোক বলে তাকে শাসন করে! মুনসির শোলোক

ফুলজান আগে অনেক শুনেছে। পোড়াদহ মেলায় মজনুর শোলোক, ভবানী সন্ন্যাসীর নামে কত শোলোক শুনেছে। তা এসব তার মনে থাকে না, কোনোদিন নিজে নিজে আওড়ায়নি পর্যন্ত। তমিজ তাকে এতসব কথা বলতো, কিন্তু শোলোক শোনায়নি কখনো। তার দুই চারটা শোলোক জানা থাকলে না হয় ফুলজান তাই জপতো মনে মনে, তমিজের বাপ হয়তো তাতে একটু ঠাণ্ডা হতো।” (পৃঃ ৩৩৫)

আসলে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী-ফকিরদের সেই আপসহীন সংগ্রাম আর তার উত্তরাধিকারীদের অপারগতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীকেই যেন আসেন মুনসি ‘বিল শাসনে’ কাংলাহার বিলের বাসিন্দাদের লৌকিক-অলৌকিক মিথ ঘেঁষা বিশ্বাসে।

তাই চেরাগ আলি, তমিজের বাপ কিংবা তমিজের মৃত্যুতে থেমে থাকে না সেই ইতিহাস পরম্পরা।

“...মুনসির জায়গা কি এখন দখল করেছে তমিজের বাপ। ...কিন্তু ফুলজানের বেটির মাথার ভেতরে বিজবিজ করে কী। তাহলে এর মাথার এই বিজবিজ আওয়াজ থেকে কথার কুশি বের হবে, সেটাকে শোলোকে গেঁথে তুলবে কি এই সখিনাই?... একি আর শোলোকে গাঁথতে পারবে? কে জানে! কী শোলোক গাঁথবে।

এখন মুনসি নাই, তার পাওনা শোলোকের কোনো টুকরাও কি আর সমিনার মাথায় গুণগুণ করতে পারবে? শোলোক গাঁথার ক্ষমতাও তো তমিজের বাপের ছিলো না।” (পৃঃ ৩৩৬)

মূলধারার ক্ষমতাশালী ইতিহাসের পাশেও সমান্তরাল বয়ান তৈরি করে চলে কাংলাহার বিলের বাসিন্দারা। ইলিয়াস সেই ইতিহাসচেতনাকে, তার সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে তুলে আনেন। ইলিয়াসের আখ্যান তাই যে প্রেক্ষাপটের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছিল, সমাপ্তিও ঘটে সেই প্রেক্ষাপটে। কেবল চরিত্র যায় বদলে, পূর্বপুরুষের জায়গায় আসে তার উত্তরাধিকার তমিজের বাপের ‘আসমানের মেঘ খেদা’বার দায়িত্ব বর্তায় তার নাতনি সখিনার উপর:

“মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে লম্বা তালগাছের তলায় পুরোনো উঁইটিবির সামনে খটখটে শক্ত মাটিতে পাজোড়া জোরে চেপে রেখে ঘাড়ের রগ টানটান করে মাথা যতটা পারে উঁচু করে চোখের নজর শানাতে শানাতে সখিনা তাকিয়ে থাকে কাংলাহার বিলের উত্তর সিথানে জখম চাঁদের নিচে জ্বলতে থাকা জোনাকির হেঁসেলের দিকে।” (পৃঃ ৩৩৬)

উল্লেখপঞ্জি

- ১। G.R. Gleig. Memories of the Life of the Right Hon. Warren Hastings First Governor-General of Bengal compiled F. London: Creative Media Partners 1841, pg: 28, pdf
- ২। W.W Humfer, *Annals of Rural Bengal*, London, Smith, Elder, And Co., 1868, Pg: 70, pdf
- ৩। L.S.S.O' Malley, *History of Bengal, Bihar & Orissa under British Rule*.
- ৪। Hutchison, Lester. *The Empire of the Nabooobs*,
- ৫। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *চিলেকোঠার সেপাই*, কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩৬
- ৬। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *খোয়াবনামা*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ ১৯৯৮ (১৯৯৬), পৃঃ ৯
- ৭। Rennel's Letter to the Council of Revenue, 1st March, 1771
- ৮। Letter of the Supervisor of Rangpur to the Council of Revenue, 15th April, 1771
- ৯। Letter from the collector of Dacca, 26th Jan, 1773
- ১০। Smith, Vincent, History of India, P-6. Pdf
- ১১। Proceedings of the Committee of Revenue, 11th April, 1783
- ১২। Glazier: Report on the District of Rangpur, p-67
- ১৩। বিবেকানন্দ, স্বামী, *বর্তমান ভারত*, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯০৫, পি ডি এফ
- ১৪। চৌধুরী, কবীর, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১, পৃঃ ১৩
- ১৫। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী; *বাঙালির আত্মপরিচয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ*; ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি, ১৯৯১, পৃঃ ১৫৮
- ১৬। মন্ডল, আলাউদ্দিন; *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*; কলকাতা: মাওলা ব্রাদার্স; ২০০৯, পৃঃ ৫১-৫২
- ১৭। দাস, সুধাময়; *বাংলা উপন্যাসে চিত্রিত জীবন ও সমাজ*, ঢাকা: কালিকলম প্রকাশনী, ১৯৯৫; পৃঃ ৭

উপসংহার

“দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর পশ্চিম গিরিবর্ষ অতিক্রম করিয়া স্রোতের মতো অনার্য আদিম জাতি শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্য সভ্যতার ইতিহাস- বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই-কিংবা যে লেখা আছে এই সব সুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আজও তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। ... আমি, বনোয়ারি সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি- উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি।”

এই যে বিচ্ছিন্নতার ‘মুখোমুখি’ দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্নতার বোধ, এই সচেতনতাই হয়তো পারে দীর্ঘদিনের অবিচারের, একশ্রেণীর হাতে ক্ষমতাপুঞ্জীভূতির সেই কাঠামোটিকে ভেঙে চুরে দিতে। নিম্নবর্গের ইতিহাসচেতনা যাকে সে একসময়ে অন্ধকারে নিষ্ক্ষেপ করেছিল, পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছিল, সেই উচ্চবর্গীয় ইতিহাসবোধ থেকে সরে আসা নয় কেবল, সেই ক্ষমতাকাঠামোর আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করে, তাকে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত করে, ইতিহাসে অস্বীকৃত, ব্যাত্য, নিম্নবর্গের মানুষ আর তাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারকে, তাদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। তথাকথিত অখন্ড ইতিহাসচেতনার মধ্যকার এই খন্ডতাকে দূরীভূত করা যেতে পারে দেশীয়, লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোর ইতিহাস অনুসন্ধানের মাধ্যমেই। পুঁজি তার উদ্ভব পর্বের থেকেই আর সবকিছুর মতোই মানুষের মূল্যবোধেরও নির্ধারক হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের এই ইতিহাসভাবনা আর্যসংস্কৃতির সেই সংস্কৃতায়নের বিরুদ্ধে এক বিকল্প ভাবনার প্রস্তাব যেমন একদিকে, অন্যদিকে উচ্চবর্গীয় অখন্ড ইতিহাস চেতনার মধ্যকার সেই ভাঙতাটিকে আমাদের সামনে হাজির করে। ভানুমতীদের ইতিহাস মূলধারার ইতিহাস লেখনীতে অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি পায়না, বলা ভালো দেওয়া হয় না। তাই দূরত্ব বাড়ে ভানুমতীদের ভারতবর্ষের সঙ্গে। ‘আরণ্যক’-এ কথকের সঙ্গে ভানুমতীর কথোপকথনে বেরিয়ে আসে সেই সারবত্তাটি:

“-আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

-আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

-ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়াইয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়াইয়া ভারতবর্ষ কোনদিকে? ...” (ঐ)

আসলে কখনও ভানুমতী, কখনও ঢোঁড়াই কিংবা কখনও তমিজদের আলাদা করে রাখতে চায় তথাকথিত মূলধারার ধারক উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিরা। প্রগতির দোহাই দিয়ে, বিপুল পরিমাণ অরণ্য ছেদন করে সবুজের সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন নতুন নগর বসছে, মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল গড়ে উঠছে বড়ো বড়ো কর্পোরেট সংস্থা কিংবা গোষ্ঠীর। কিন্তু খেয়াল করলে দেখব এর মধ্যে নিম্নবর্ণ কোথাও নেই। পুঁজি কৌশলে তাকে বহিষ্কার করেছে। আর এই বহিষ্কারের রাজনীতিটির বিরুদ্ধেই নিম্নবর্ণের সপ্রশ্ন, সদর্থক উত্থান আজকের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যে নিম্নবর্ণের মানুষকে শক্ত বাঁধনে বাঁধতে পারেনি, তার মূলে তাদের সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার কিংবা ইতিহাসকে অনুধাবন করতে না পারা। আর সেই ব্যর্থতার রূপাবয়বটি সতীনাথ যেমনভাবে তুলে এনেছিলেন ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’-এর পাঠে:

“...মাকড়সার জালের মতো হালকা সুতোর বাঁধন; ধরতে গেলেই ছিঁড়ে যায় এমন মিহি সবসময় বোঝাও যায় না আছে কি নেই; হাওয়াতে যখন দোলা দেয়, ভোরের শিশিরে যখন ভিজে ওঠে, হঠাৎ রোদের ঝলকানি লাগে, তখন দেখা যায়; তাও খানিক খানিক। রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাত্মাজী। সেই পশ্চিমা মেয়েটার বাঁধন, সেই সাত বছরের ছেলেটার বাঁধন, সাগিয়ার বাঁধনের মতো এ বাঁধন কেটে বসে না গায়ো। ঝামা দিয়ে ঘষলেও কলজের উপর থেকে সেগুলোর দাগ তোলা যায় না, কিন্তু এটাতে কেবল আমলকী খাওয়া মুখের মতো একটা ফিকে স্বাদ রেখে যায়।”^২

তেমনি ইলিয়াসের পাঠেও আমরা উঠে আসতে দেখেছি কাঁটাতার দিয়ে বিভাজনের সেই রাজনীতিটি, যাতে কেবলমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তরই হয়, আর কাঁটাতারের দু’পাশের অসংখ্য মানুষ থেকে যান সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত জীবনযাপনে। যেখানে বিভূতিভূষণের ভানুমতীর মতোই খানিকটা ইলিয়াসের আখ্যানের এক বালক চরিত্র তার বাবার কাছে জানতে চায়:

“...‘ইনডিয়া কই বাবা’? ওই তো স্টেশনের ওপারে। ওই যে রিকশা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে’।

...লোকটার আঙুলধরা ছেলেটি ঘ্যানঘ্যান করেই চলেছে, ‘ইনডিয়া কই বাবা? ও বাবা।’ লোকটির বাঁ পাশে সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো বউটা বলে, ‘ওই তো বাবা, ওই যে’। মেয়েটির কান্নাবসা গলার কথা ছেলেটির বিশ্বাস হয় না, ‘কই? সব তো একইরকম’।”^৩

অতএব, শাসকবর্ণের এই যে নির্মাণ তা ইতিহাস সংস্কৃতি কিংবা ভাষা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তাতে তা কেবলমাত্র শাসকের স্বার্থকেই সুরক্ষিত করে, একইসঙ্গে শাসনব্যবস্থায় শোষিত মানুষের স্বার্থকেও বিপন্ন করে

তোলো। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ, কিংবা ইতিহাসচর্চার দিকে যদি খেয়াল করি, দেখব সেখানে উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, সে তুলনায় নিম্নবর্গের অবস্থান একেবারেই গৌণ। ফলত:

যে ইতিহাস আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা কেবল উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি; প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সহায়ক একধরনের ইতিহাস। আর এই ‘ইতিহাস’ স্বাভাবিকভাবেই ‘খন্ডিত’। নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর এই ইতিহাস তুলে ধরেনি। উচ্চবর্গ তাদের মতো করে নিম্নবর্গের সেই ভাষাকে তৈরি করে নিয়েছে, নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তা পরিবেশন করেছে। সেজন্যই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক প্রশ্ন তুলেছেন, ‘can the subaltern speak?’

রণজিৎ গুহও তুলে ধরেছেন উচ্চবর্গের ইতিহাসলেখনীর সেই ফাঁপা যৌক্তিক কাঠামোটিকে:

“এই ইতিহাসবিদ্যার আর একটি জন্মলক্ষণ হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব শাসকদেরই মনোভাবের প্রতিফলন। ... সে আর তখন প্রভুশক্তির সমালোচক নয়, নতুন ভূমিকায় সে প্রভুশক্তির স্তাবক। ...এতদেশীয় উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধা একই সঙ্গে স্বীকৃতি পায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিতে এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যায়। ইতিহাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে এই উচ্চবর্গের স্থান তখন ইংরেজদের ঠিক পরেই। ...আঠারো শতকের যে ইতিহাসবিদ্যা ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সার ফলে একটা ঔপনিবেশিক বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল, ভারতের বিশেষ অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তাঁর ঝাঁক ছিল উচ্চবর্গের স্বপক্ষে। ... এইভাবেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের বিশাল আন্দোলনগুলি পরিণত হয়েছে উচ্চবর্গের সংকীর্ণ জীবনবৃত্তান্তে।”^৪

তাই উচ্চবর্গের আধিপত্যকামী মানসিকতায় নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাসচেতনার রূপটি অধরাই থেকে গেছে। জহর সেন মজুমদারও উচ্চবর্গের ইতিহাস নির্মাণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাহিত্যে কীভাবে মূলধারার প্রতিস্পর্ধী বিকল্প ইতিহাসচেতনার ভাষ্য তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বিকল্প ইতিহাসের নির্মাতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সাহিত্যের মধ্যেও যে সমানভাবে বলবান, তার সেই প্রযোজ্যতার দিকটি আমরা এ প্রসঙ্গে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

ইতিহাস রচয়িতা যখন ইতিহাস লেখেন, তখন তার মধ্যে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সাহিত্য লেখকের মধ্যেও যে তা থাকে না, তা একেবারেই নয়। ইতিহাস লেখক অনেক ক্ষেত্রেই সেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। ফলত: তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা রাজনৈতিক মতামত সম্পৃক্ত ব্যক্তির গবেষণাতে পর্যবসিত হয়। জহর সেন মজুমদার উল্লেখ করছেন:

“... ‘ইতিহাস’ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন সংগঠনপ্রক্রিয়া থেকে বার হয়ে আসতে না পারলেও ‘সাহিত্য’ কিন্তু পারে। ‘ইতিহাস’ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা-সদিচ্ছার পথ ধরে চললেও ‘সাহিত্য’ কিন্তু ব্যক্তির কর্তৃত্বের পথ ধরে চলে না। ‘ইতিহাসে’ ব্যক্তি সার্বভৌম কর্তা, কিন্তু সাহিত্যে ব্যক্তি একসময় অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং ‘ইতিহাস

রচয়িতা’ এবং ‘সাহিত্য রচয়িতা’ এক নয়। দৃষ্টান্তসিদ্ধ তফাত থেকেই ঐতিহাসিক যেভাবে নিম্নবর্গের উপস্থাপনা করবেন, একজন সাহিত্যস্রষ্টা কিন্তু কিছুতেই নিম্নবর্গকে সেভাবে উপস্থাপিত করবেন না। উচ্চবর্গের ‘অপর’ হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সংমিশ্রিত শ্রেণিচৈতন্যের অভিলাষী ক্ষমতাতন্ত্রের ভেতরও নিম্নবর্গকে কীভাবে প্রতিরোধী আকল্প দেওয়া যায়-সেই প্রক্রিয়াটি একজন ঐতিহাসিকের থেকেও কিন্তু একজন প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টার অনেক বেশি জানা।”^৫

নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করা রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিংবা স্পিভাকেরা নিম্নবর্গকে সামাজিকভাবে ব্যত্য করে রাখার যেসব সামাজিক পন্থা বা পদ্ধতি, তার মধ্য থেকে ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর, তাদের ভাষ্যকে তুলে আনবেন, এরকম অভিপ্রায়ই তারা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু জহর সেনমজুমদার নিম্নবর্গের ইতিহাস চেতনাকে দেখছেন:

“এই বিকল্প ইতিহাস প্রতিস্থাপনার জন্যই একজন ঐতিহাসিকের দরকার সাহিত্যিকের হৃদয় সংবেদন আর একজন সাহিত্যিকের প্রয়োজন ঐতিহাসিকের পদ্ধতিগত অনুসন্ধাননিষ্ঠা।” (ঐ)

তাই নিম্নবর্গের চেতনাকে, তাদের সংস্কৃতি ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাহিত্য এক অগ্রগামী হাতিয়ার হয়ে উঠতেই পারে।

সাহিত্যে উচ্চবর্গের একাধিপত্যকে যেমন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় ‘আরণ্যক’-এর ভানুমতী, গাঙ্গোয়া, হাঁসুলিবাঁকের করালী, ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র কুবের, ‘অরণ্যের অধিকার’-এর বীরসা, ‘টোঁড়াই চরিতমানস’-এর টোঁড়াই, ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে খিজির, ‘খোয়াবনামা’-র তমিজ, বৈকুণ্ঠ, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ অনন্ত, কিংবা ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এর বাঘারুনা, তেমনি এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র বয়ানও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে, যা সামাজিক-অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ক্ষমতার গন্ডীকে, ভারসাম্যহীনতাকে তার রক্তঘাম দিয়ে মুছে ফেলতে চায়।

উল্লেখপঞ্জি

- ১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; *আরণ্যক*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: , বাৎ শ্রাবণ ১৪১৪, (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩)
- ২। ভাদুড়ী, সতীনাথ; *সতীনাথ গ্রন্থাবলী*; দ্বিতীয় খন্ড; সম্পা: শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য; কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ: ২৬৩
- ৩। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *খোয়াবনামা*; কলকাতা: নয়া উদ্যোগ; ১৯৯৮ (১৯৯৬) পৃ: ৩২৫
- ৪। গুহ, রণজিৎ; *নিম্নবর্গের ইতিহাস*; *নিম্নবর্গের ইতিহাস*; সম্পা: গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১ (১৯৯৮)
- ৫। সেনমজুমদার, জহর; *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, *সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা*; সম্পা: আফিক ফুয়াদ; কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃ: ২৩

গ্রন্থপঞ্জি

- ভাদুড়ী, সতীনাথ; *সতীনাথ গ্রন্থাবলী*; দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা: শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য; কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৯
- ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *খোয়াবনামা*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮(১৯৯৬)
- ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ ২০০০, ১৯৯৭
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭ (২০০০)
- সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮ (১৯৯৮)
- রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলকাতা: র্যাডিকাল ২০১১ (১৯৬৬)
- মন্ডল, আলাউদ্দিন; *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯
- রায়, রজতকান্ত; *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪
- দাশগুপ্ত, অতীশ; *কৃষকের চেতনা: বাংলার উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে*, কলকাতা: নন্দন, বাং ১৩৯৩
- ঘোষ, বিনয়; *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০০৯ (১৯৫৮)

- ভট্টাচার্য, আনন্দ; *সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ-ইতিহাস পুনর্বিবেচনা*; কলকাতা: গাঙচিল ২০১০
- দাশগুপ্ত, অশীন; *ইতিহাস ও সাহিত্য*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯
- বিশ্বাস, মনোহর মৌলি; *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা: বাণীশিল্পঃ ২০০৭
- Marcuse, Herberts, *Eros and Civilization*, Boston: Beacon Press, 1966 (1955). www.marxists.org. 19.12.18, 10.54.
- হাবিব, ইরফান; *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, কলকাতাঃ ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২০০৯ (১৯৯৯)
- সেনমজুমদার, জহর; *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৭
- সম্পাঃ ডঃ চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা রায়মন্ডল, *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, কলকাতাঃ অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০৩
- ইগলটন টেরী; *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা*, অনুঃ নিরঞ্জন গোস্বামী; কলকাতাঃ দীপায়ন, ২০০১
- Williams, Raymond, *Marxism and Literature*, New York: Oxford University Press, 1997, pdf
- Eagleton Terry, *Marxism and Literary criticism*, London: Routledge, 2006 (1976) pdf
- Williams, Raymond. *Culture & Society*. India: Spokesman Books, 2013 (1958)

- Imtiaz Ahmed & Shashi Bhushan Upadhyay. *Dalit Assertion in Society: Literature and History*. New Delhi: Orient Blackswan, 2015 (2010)
- O' Hanlon Rosalind. *Caste, Conflict, and Ideology*, New Delhi : Permanent black. 2019 (2002)
- আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার রেনেসা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা; *স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস নিম্নবর্গের অবস্থান*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০০৫
- সম্পা: দেবব্রত বিশ্বাস, *বাংলা উপন্যাস চর্চা*, কলকাতা: ব্যঞ্জনবর্ণ, ২০১৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; *আরণ্যক*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বাং, শ্রাবণ ১৪১৪ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩)
- ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান; *চিলেকোঠার সেপাই*, কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৯৩
- সম্পাঃ সৌরীন ভট্টাচার্য, *মার্কসবাদী বাঙালি*, কলকাতা: তালপাত, ২০১১
- বিবেকানন্দ, স্বামী; *বর্তমান ভারত*, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯০৫
- Hamilton , Paul, *Historicism*, London: Routledge, 2005 (1996), pdf
- Bently, Michael, *Companion to Historiography*, London: Routledge. 2006 (1997).pdf
- Tucker, Aveizen, *A companion to the Philosophy of History and Historiography*. US: Blackwell, 2009 (2009).pdf
- Freud, Sigmund. *The interpretation of Dreams*. (First part) Volume IV. London: Vintage 2001 (1953)

- সম্পা: আফিক ফুয়াদ, *সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা*, কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য; চতুর্দশ বর্ষ
তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা
- *সতীনাথ সংখ্যা*, 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা; কলকাতা: কোরক, বইমেলা, ২০০৬